শ্রীশ্রীরাধা রসামৃত (ShriShriRadha Rasamrita) "ভাগবত-গঙ্গোতরী" ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা

শ্রীশ্রীরাধা রসামৃত

"ভাগবত-গঙ্গোতরী"

ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

দাসানুদাসাভাস

বৃন্দাবনবন্ধু

শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা শ্রীরাধা

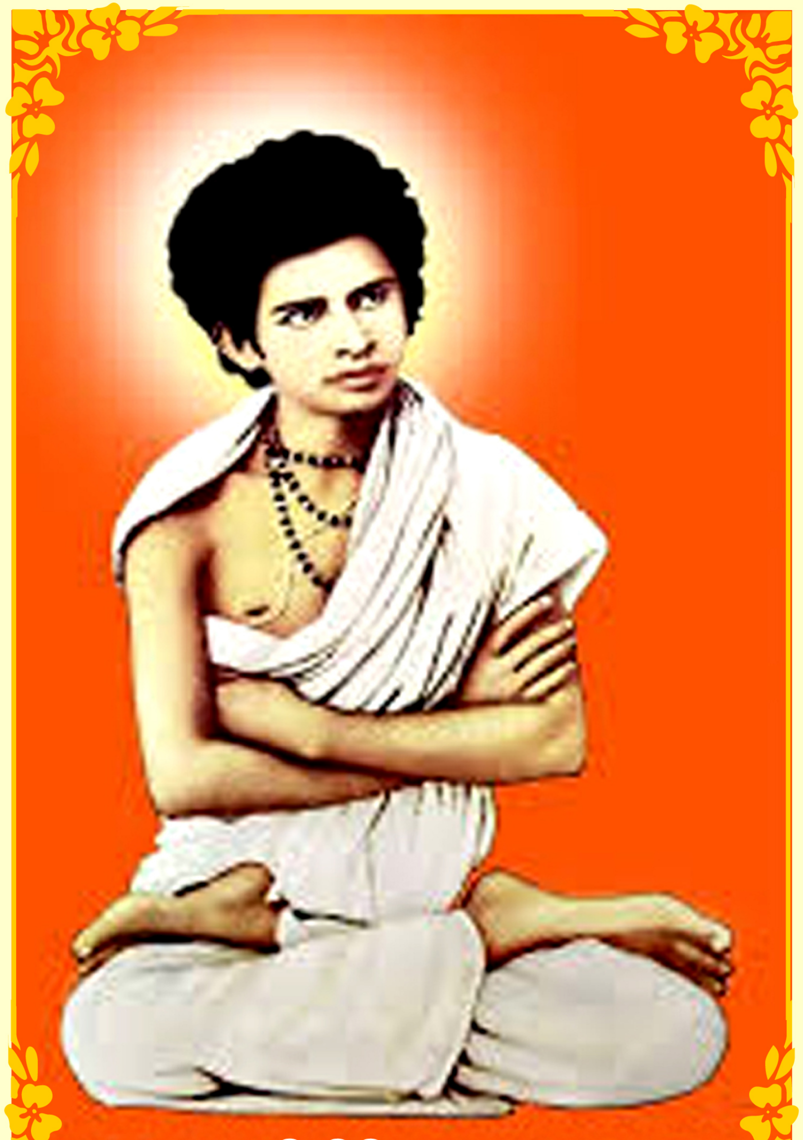

মহাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

সঙ্কলনে

বৃন্দাবন বন্ধুভক্ত

রাধা মেরী স্বামিনী ম্যাঁয় রাধে কো দাস। জনম-জনম মোহি দীজিয়ো শ্রীবৃন্দাবনবাস ।।

প্রথম প্রকাশ : শ্রীসীতানবমী, বঙ্গাব্দ ১৪২৭ (ইংরাজী মে ২০২০)

প্রকাশনে-
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী
শ্রী বৃন্দাবনধাম, মথুরা, উত্তর প্রদেশ

মুদ্রক
বর্ণালী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স
৯, প্রেম নগর, অবধপুরী, বি.এইচ.ই.এল., ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ
মোবাইল : ৯৮২৭২৬২৩৪২

হরফবিন্যাস
প্রদীপ কুমার মন্ডল
৯, প্রেম নগর, অবধপুরী, বি.এইচ.ই.এল., ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ
মোবাইল: ৯৮২৭২৬২৩৪২

মাধুকরী- অকৈতবে পঠন-পাঠন

Book- ShriShriRadha Rasamrita (Shadhya Sadhan Tattva)

Convoluted by– VridavanBandhu (Sankalayita)

First Published : ShriSitaNavami, Bangabda 1427, May 2020

Published by:
Shri Shri Vrindabanissari
Shri Vrindaban, Mathura, U.P.

Printed by:
Barnali Printers & Publishers
9, Prem Nagar, Awadhpuri, BHEL, Bhopal (M.P.)
Mob.: 9827262342

Composing & Typesetting:
Pradeep Kumar Mandal
9, Prem Nagar, Awadhpuri, BHEL, Bhopal (M.P.)
Mob.: 9827262342

Price : Frankly Reading/Teaching

বইয়ের সমস্ত বিষয় অধিকার এবং দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব।
মুদ্রকের কোন রূপ দায়বদ্ধতা নেই।

ভূমিকা

"।।ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।।"

শুধুমাত্র মানুষই নয়, প্রত্যেকটী জীবের চরম ও পরম অভীষ্ট এই শ্লোকার্দ্ধে বর্ত্তমান। কিন্তু মানব সভ্যতারও নিরানব্বই ভাগ এ সম্বন্ধে সতেচন নয়। কারণ মায়ার খেলা, ভগবানের লীলা। ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী। প্রত্যেকটী জীবই সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ। তাই সকলের অভীষ্ট- সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সত্তা, চেতনা ও আনন্দ। আমরা প্রতিনিয়ত জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে- এরই জন্য জীবনধারণ করে চলেছি, কিন্তু এক অতি আশ্চর্য্য বিষয় আমরা অধিকাংশেই এ বিষয়ে অচেতন।

এ তো গেল সমগ্র মানব জগতের ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা আধাত্মিক জগতে আছেন, তাঁরাও কি সম্পূর্ণ চেতনাযুক্ত? বিশেষ করে যাঁরা যুগল উপাসনা অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত এবং তন্মধ্যে যাঁরা গৌড়ীয় ভাবাদর্শে ভাবান্বিত তাঁদের কি অবস্থা?

বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ এমনকি অনেকে আছেন যারা সমগ্র জীবন ভরে মালা ঝুলিতে ভগবানের অবিচিন্ত্য "নাম সাধনে" সম্পূর্ণ ভাবে রত থাকার পরেও "নাম রস ও আনন্দের" অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। সকলে নয় তবে অধিকাংশ। কেন?

ভেবে অবাক হয়ে যাই, ত্রিশ বছরেরও বেশী হয়ে গেছে শ্রীগুরু কৃপায় অভিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে স্থির ও দৃঢ়মতি হতে পারিনি। অথচ এই তত্ত্ব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে খুব ভালভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। না জানি কতবার শ্রীগ্রন্থের অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন কি শ্রীগুরুদেবের গৌরকথাও পাঠ করা হয়েছে। আশা করি অনেকেই পাঠ করেছেন কিন্তু স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়মতি হতে পেরেছি কি?

আসলে আমরা সকলে খুব ভালভাবেই শ্রীগ্রন্থের সেবন করেছি কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি সমগ্রভাবে আলোকসম্পাত হয় নাই। শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্তে গুরুত্ত্ব দেওয়া হয়নি অথচ এখানেই যুগল উপাসনারত সমগ্র বৈষ্ণবগণের চরম ও পরম বস্তু লুকায়িত আছে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন **"নাম"** এবং সাধ্য-শিরোমণি **"রাধাপ্রেম"** এখানেই সুব্যক্ত। অথচ আমাদেরকে এ বিষয়ে মুখ্য ও একান্ত ভাবে আলোকপাত করা হয় না তাই আমরা এ বিষয়ে সচেতন নই।

দাস অতি মূঢ়, জ্ঞান-ভক্তি, বুদ্ধি-বিবেকহীন তথাপি প্রভুবন্ধু করুণা ও শ্রীগুরুকৃপা প্রেরণায় এই তথ্য সংকলনের গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রয়াসে ব্রতী হয়, পরিণামস্বরূপ এই গ্রন্থকলেবর। পরম করুণাময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপা-করুণায় কেহ যদি স্বল্পমাত্রও উপকৃত হন, তবে সেই সব মহৎগণের এবং ভগবদানুরাগী সমস্ত ভক্তবৃন্দের পদরজঃ শিরে ধারণের অভিলাষী এই দীনাতিদীন-কীটাধম।

শ্রীগুরু দাসানুদাসাভাস
বৃন্দাবনবন্ধু

সূচীপত্র

ক্রমাংক	পদ	পৃষ্ঠা
(১)	সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব	৫
(২)	সাধন-রহস্য	১২
(৩)	প্রেম-ধর্ম্ম	৩০
(৪)	ব্রজ-তত্ত্ব	৩৪
(৫)	সাধন-তত্ত্ব	৩৭
(৬)	সাধ্য-তত্ত্ব	৪৫
(৭)	নাম-প্রেম-মালা	৭৬
(৮)	শ্রীরাধা-নামামৃত	৮০

শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধস্বরূপে আত্মভাবনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভূতশুদ্ধি। অতএব সেই ভাবনা লইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনে সাধক এই গ্রন্থের সমধিক রসমাধুরী আস্বাদনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশেষ করুণার দান এই রাধা দাস্য। মধুর রসের পাত্রী হইয়াও দাসী। রূপে গুণে, কিশোরী, অন্তরঙ্গা সেবাধিকারিণী। মধুর রসান্তর্গত ভাবে সেবা এই দাস্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হার্দ্য ও কাম্য।

কুঁবরি কিশোরী লাড়িলী, করুণানিধি সুকুমারি। বরনো বৃন্দা বিপিন কো, তিনকে চরণ সঁভারি।।

জয় শ্রী রাধে

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

গুরু, আচার্য্য, ইষ্ট (প্রিয়া-প্রিয়তম) একই তত্ত্বস্বরূপ কিন্তু রূপ ভিন্ন-ভিন্ন। এজন্য বলা হয় - ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু চতুর্নাম বপু (তত্ত্ব) এক। ভক্ত যখন শরীর এবং সংসারকে ভুলিয়ে প্রেমে মাতোয়ারা হন তখন সব একাকার হয়ে যায়, এক অখণ্ড তত্ত্ব ভিন্ন কিছুই অবশেষ থাকে না। তাই শ্রীরাধা (যুগল) ও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরে কোন ভেদ নেই কিঞ্চিৎমাত্র তফাৎ নাই। ঠিক এ জন্যই প্রভু নিজের পরিচয় দিচ্ছেন -

শ্রীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্গিণী- পৃষ্ঠা ১৪৫,

পিতা	*বৃষভানুরাজা*
মাতা	*কৃত্তিকা*
শ্বশুর-শাশুড়ী	*নন্দ-যশোদা*
পতি	*কৃষ্ণ*
গতি	*গৌর*
গুরু	*বন্ধু*
সেবা	*রাই*
দশা	*ললিতা*
সাধনা	*কীর্ত্তন*
ভজন	*মালাজপ*
স্মরণ	*যুগলমিলন*
দর্শন	*গৌর*
পঠন	*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।*

যুগলের প্রতি মানসে যে-যে কার্য্য ও আচরণ তাহাকেই ভজন কহে তাৎপর্য্য হল সদা-সর্ব্বদা যুগল চিন্তন ও স্মরণই আমাদের সাধন ভজন।

রসের আধারে কীর্ত্তন, ভজন, জপ ও উপাসনার বিষয়ে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন -

রাধা রাধা নাম জো সপনে মেহু লেয়। তাকো মোহন সাঁবরো রীঁঝি অপনে কো দেয় ।।

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম ।
(জপ) রাধামাধব রাধিকা নাম ।।"

কীর্ত্তনীয় কি - এপদটী সদা সর্ব্বদা কীর্তনীয় ।
ভজন কি - কৃষ্ণ গোবিন্দ, গোপাল, শ্যাম ।
জপ কি - রাধামাধব ও রাধা নাম ।

এখানে যুগলমন্ত্র অর্থাৎ রাধামাধবের জপের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সর্ব্বোপরি রাধা নামের উপর জোর দিয়ে বলছেন রাধিকা নাম। অবশ্য এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে- যুগলমন্ত্র - রাধামাধব নাম বা মহামন্ত্র সদাসর্ব্বদা অর্থাৎ দিন-রাত জপ করা হয়ে উঠবে না, তাই বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে শ্রীরাধা নামে - যে প্রতিক্ষণ শ্বাসে-প্রশ্বাসে বাচিক, উপাংশু ও মানসিক যে কোন ভাবে শ্রীরাধা নাম সদাসর্ব্বদা জপনীয় অর্থাৎ জপ করা সম্ভব তাই যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়ত আসনে বিশেষ করে মালায় জপ কার্য্য হবেন তখন শ্রীযুগলমন্ত্র অর্থাৎ মহামন্ত্র এবং অন্য সময়ে সর্ব্বক্ষণ অনবরত তৈলধারাবৎ কেবল মাত্র শ্রীরাধানামই জপ হবেন। যেহেতু আমাদের গুরু পরম্পরা করুণাময়ী নিত্যকিশোরী শ্রীশ্রীরাধা থেকেই প্রচলিত সুতরাং শ্রীরাধা নামই আমাদের সার হওয়া উচিৎ। শ্রীরাধা নামই আমাদের একান্ত প্রয়োজন বললে অত্যুক্তি হবে না।

এখন দেখতে হবে আমাদের উপাসনার বিষয়টা কি এবং কেমন? শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাবাণী থেকেই আমরা এই তথ্য ও তত্ত্বটা বের করার চেষ্টা করব। প্রভু বলেছেন-

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধা মাধব রাধিকা নাম।। "

এরই মধ্যে আছে আমাদের উপাসনা। রসের উপাসনা। রসের উপাসনা মুখ্যতঃ চার প্রকার। যদিও পাঁচ প্রকার ধরা হয় কিন্তু একটু আলোচনা করলে বুঝতে পারবেন মুখ্য চার প্রকার, কেননা শান্তরসকে

রস-ভিত্তিক স্থাপনা করতে কষ্ট হয়। কারণ শান্তরসে প্রীতির ছোঁয়া নাই বললেই চলে। তাই মুখ্যতঃ রস চার প্রকার। দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস।

এই রসের উপাদান শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণীতে কেমন ভাবে প্রকটিত সেটাই আমরা বিবেচনা করব। অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বিরচিত সংকীর্তন পদামৃত গ্রন্থের ভূমিকা লেখক ডঃ শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীশ্রী অতুল বন্ধু) অনেক আগেই, মতলব আজ থেকে সত্তর বছরেরও বেশী আগেই দিকনির্ণয় করেছেন। কেমন সেটা বলছি- শ্রীসংকীর্তন পদামৃত গ্রন্থে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ও ১৩ তে উল্লেখ করেছেন-

"(জয় জয়) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম ।।"

কৃষ্ণ গোবিন্দ - দুইটী নাম শান্ত ও দাস্যের সাধারণ নাম।
গোপাল - নামটী সখ্য ও বাৎসল্যের বিশেষ চিহ্নযুক্ত।
শ্যাম - শব্দটি মধুর ভাবের পরিচায়ক।
রাধামাধব - নাম মধুরতম রসবোধক।
শেষে 'রাধিকা' নাম কেন ?

এই সকল ভাবের মূল কেন্দ্র রাধারাণী - কৃষ্ণ প্রেমের একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী - সাধ্যশিরোমণি শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী। তাই ওই নামটি বিশেষ ভাবে কীর্তনীয়, ভজনীয় ও স্মরণীয়। রাধারাণী ও তাঁহার ভক্তগণ ভিন্ন কৃষ্ণে মতি দিবার অধিকার শ্রীভগবানের হাতেও নাই। পতি কোথায় পাবেন পতিভক্তি। পত্নীই তাহার একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী। তাই কৃষ্ণভক্তি রাধারাণীর ধন। তাহা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নাই - পাত্র বিচার তাঁহার হাতে থাকিলেও ভক্তি ও প্রেম রাধারাণীর নিজস্ব সম্পদ। তাই শ্রীভগবানও যখন পাত্রাপাত্র বিচারশূন্য ভাবে জীবকে এই গোলোকের গুপ্ত রাধাপ্রেম ধন বিতরণ করিলেন, তখন রাধাভাব ও কান্তি অঙ্গীকার

করিয়া আসিলেন - *'রাধিকার প্রাণপতি ; কি ভাবে কান্দয়ে নিতি, ইহা বুঝে ভকত সমাজ'* (নরোত্তম ঠাকুর)। এজন্য সর্ব্বশেষে বলিলেন, 'রাধিকা নাম'। তাই ব্রজধামে সর্ব্বত্র ব্রজবাসীগণের মুখে কৃষ্ণনাম নাই- তাঁরা বলেন 'রাধে-রাধে' বা 'জয় রাধে'। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরও প্রথম সংকীর্তন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন 'শ্রীমতি'- এই গ্রন্থের প্রথমে তাহার স্বহস্তে লিখিত 'রাধা' প্রশস্তির ব্লক দেখা যায় ।

জয় রাধে ধর্ম্ম
জয় রাধে জয়
জয় রাধে কর্ম্ম
জয় রাধে রয় ।।

এই তথ্যটা আমরা একটু খতিয়ে নিতে চাই কেমন?

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধা মাধব রাধিকা নাম ।।"

রসের আসরে প্রবেশের পূর্বে বিশুদ্ধ চিত্ত, মন ও নিতান্ত নির্ম্মল হৃদয় চাই। তাই আগে শান্তরস আসে। শান্তরস প্রীতিরস ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার। শান্তরসে হৃদয় নির্ম্মল থাকে ও চিত্ত মনে শান্তি ধারণ করে। তাৎপর্য্য এই যে যত সময় না শরীরও সংসার থেকে নিজেকে উপরে উঠাতে পারছি তত সময় কেহ শান্তরসেই প্রবেশ পায় না। প্রীতিরস তো দূরের কথা - শান্তরসেই উপস্থিতির জন্যে চাই বিশুদ্ধ চিত্ত মন ও হৃদয়। দেহাভিমান ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কামনা-বাসনা বা সুখের চাহিদা থাকলে শান্তরসেই পৌঁছানো যায় না। আর যত সময় শান্তরসের স্থিতি না আসছে প্রীতিরস অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস সুদূর পরাহত। একেবারে নাগালের বাইরে। কোন প্রকার সমঝৌতার অবকাশ নাই। মতলব হল সবার আগে দেহাধ্যাস বর্জন এবং তারপরেই ভাবদেহ (সিদ্ধ দেহ) গ্রহণপুর্ব্বক প্রীতিরসের ভূমিতে প্রবেশাধিকার। তাই শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রথম প্রেমবাণী হচ্ছে- ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম। অর্থাত সর্ব্বাগ্রে চাই ব্রহ্মচর্য্য

আর এই ব্রহ্মচর্য্যের আন্তরিক আশয় হচ্ছে - বিষয় চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে । প্রভু বা ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) চিন্তন অতিরিক্ত যাবতীয় চিন্তা বিষয় চিন্তা বা অসৎ চিন্তার অন্তর্গত। তাই বিষয় চিন্তা বা অসৎ চিন্তা বা শরীর ও সংসারের চিন্তা পরিহার করলে আসবে ব্রহ্মচর্য্য এবং তখনই হরিনামের সার্থকতা। হরিনাম চিন্তামণি বলাবাহুল্য, কিন্তু হরিনামের সার্থক পরিণাম আসে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক সাধন ভজনে। আর সেটা সম্ভব হয় তখনই যখন সম্পূর্ণরূপে শরীর ও সংসার চিন্তন থেকে নিজেকে বিরত করা হয়।

যাই হোক, শ্রীশ্রীপ্রভুর সার্ব্বজনীন সাধনাবাণী হচ্ছে - ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম। কিন্তু যিনি আরও অগ্রসর হতে চান, ভগবৎপ্রীতির রসাসরে প্রবেশ করতে চান তিনি এই কীর্ত্তন বাণী অনুসরণ করবেন।

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধামাধব রাধিকা নাম।।"

(১) এখানে কৃষ্ণ নামে শান্তরসের স্পর্শ ও দাস্যরসে স্থিতি। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়- 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'।
(২) গোবিন্দ ও গোপাল নামে সখ্য ও বাৎসল্যরসের স্থিতি ।
(৩) শ্যাম নামে মধুররসের স্থিতি।

যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম পর্য্যন্ত স্থির না থেকে অর্থাৎ এরও আগে ভজন করতে চান তিনি এই রসোপাসনার দিকে অগ্রসর হবেন।

(১) যে দাস্যরসে রুচি রাখে বা আসক্ত সে কৃষ্ণ নাম ও রূপের আশ্রয় নিয়ে সেবা বা ভজন করবে।
(২) যিনি সখ্য বা বাৎসল্যরসে রুচি বা আসক্তি করবেন তিনি গোবিন্দ ও গোপাল নাম ও রূপের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন বা সেবা করবে।
(৩) যাঁরা এরও আগে যেতে চান তাঁরা শ্যাম নামে ও রূপের আশ্রয় নিয়ে সেবা-ভজনে মেতে থাকবেন।

মধুররসে আবার স্তরভেদ করেছেন। গোপী আনুগত্যে ভজন, সখী

আনুগত্যে ভজন ও সর্ব্বোপরি মঞ্জরী আনুগত্যে ভজন। মধুররসে কোথাও স্বসুখ বাঞ্ছার বালাই নেই- তবুও রস ও আনন্দের স্তরের ভেদে ক্রমোন্নতি।

গোপী, সখী ও মঞ্জরী আনুগত্য বলতে কুঞ্জ, নিকুঞ্জ ও নিভৃত নিকুঞ্জের সেবা বোঝায়। এরা সবাই রাধামাধবের ভজন বা সেবা করবেন কিন্তু রসের তারতম্য আছে। সর্ব্বোপরি মঞ্জরীভাব সাধনা যা একমাত্র রাধা দাস্যেই সম্ভব। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু বলছেন ভজন বা সেবা হবে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল ও শ্যাম নাম বা রূপের, আর জপ হচ্ছে রাধামাধব (যুগলমন্ত্র বা মহামন্ত্র) ও রাধা নামের।

এ বিষয়ে শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণীই প্রমাণস্বরূপ তাই এখানে প্রভুর বাণীর কিছু পঙ্ক্তির উদ্ধরণ দেওয়া হচ্ছে ।

সংকীর্তন পদামৃত পদসংখ্যা- ১০১

একবার রাধা-রাধা-রাধা বলে নাচরে রাখালগণ

....

(ভাইরে রাধা-রাধা-রাধা বলে)

....

পেয়ে রাধাপদ কোকনদরে জুড়াবে তাপিত জীবন ।

....

(আমার) রাধা মন্ত্র জপ তপ হৃদয় ভূষণ ।
যদি চাহ শ্যামে রাধা নামেরে রাখ রুচি অনুক্ষণ ।

....

আমি কায় মনে সে চরণেরে করেছি সব সমর্পণ ।।

সংকীর্তন পদামৃত পদসংখ্যা- ১২৭

"জাগ রাধাশ্যাম মোর হৃদয় দ্বিদলে রে ।
ধোয়াব চরণ আজি নয়নের জলে রে ।।
জগদ্বন্ধু দাসে রাধে রেখ পদতলে রে ।
গোপীদেহ দিও মুই সেবিব যুগলে রে ।।"

সংকীর্তন পদামৃত পদসংখ্যা– ১৪৭

"রাধে রাধে বল বদনে।
যদি যাবিরে বৃন্দাবনে ।।
ভজ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল
অধরে মধুর হাসি মুরলী রসাল ।"

....

এ যাবৎ ভূমিকার অবতারণা হল। এখন আমরা ধীরে-ধীরে মুখ্য বিষয় প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর ও সাধ্য-সাধন তত্ত্বের পথে অগ্রসর হব। যার পাথেয় হবে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুবাণী ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের রচনা ও প্রেরণা। শ্রীশ্রীগুরুদেব যা আস্বাদন করেছেন তার আধারে- তাঁকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হব। কিন্তু প্রথমে আমরা সাধনরহস্য বিষয়ে আলোচনা করব এবং তৎপশ্চাৎ প্রেমধর্ম্ম, ব্রজতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্বের দিকে প্রধাবন অর্থাৎ আলোচনা ও বিবেচনা হবে। কিন্তু মূল ও আশ্রয় হবে *শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম । জয় গুরু, জয় জগদ্বন্ধু, জয় শ্রীরাধে ।*

শ্রীশ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দারজী মহারাজ

শ্রীশ্রীরাধা রাণী

শ্রীশ্রী রাঘববাবাজী মহারাজ

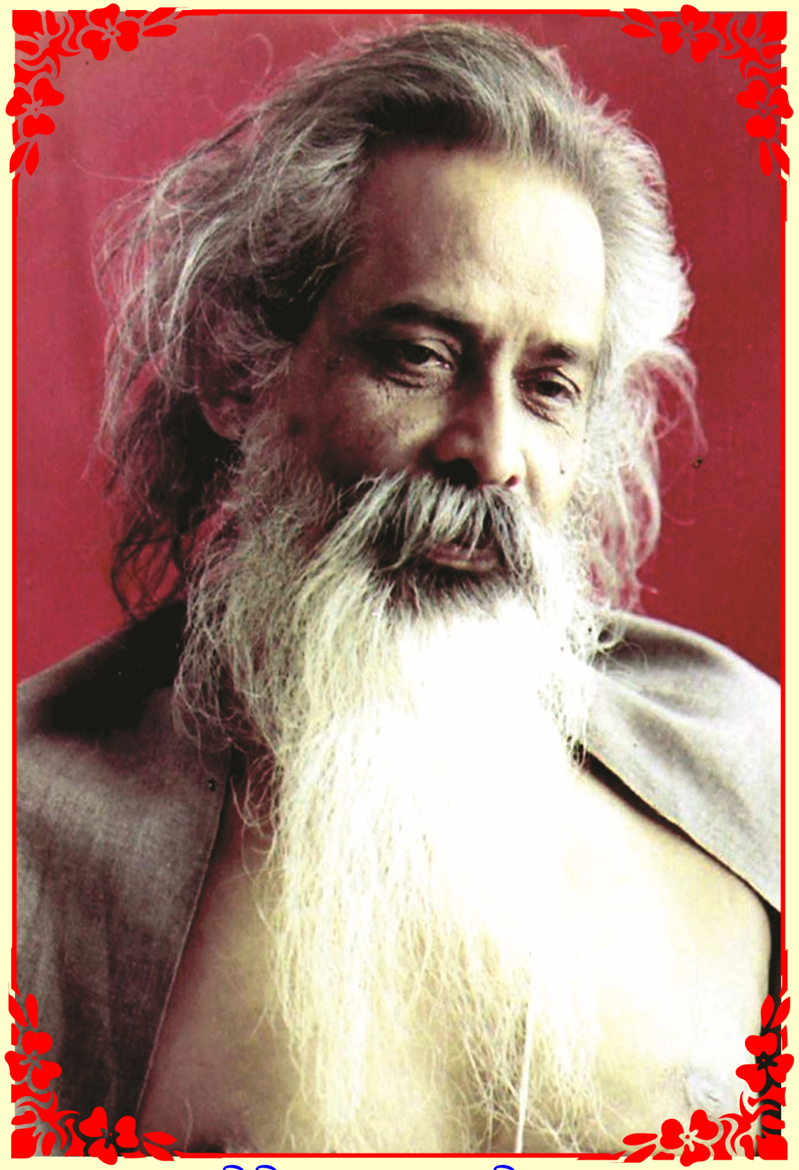

পূজ্যশ্রীশ্রী বালকৃষ্ণ দাসজী মহারাজ

জয় শ্রী রাধে

সাধন-রহস্য ও প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব পৃথক-পৃথক আলোচিত হবেন। উভয়কে একত্র করিয়া বিচার করিলে এক অভিনব সাধনরহস্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু ও প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের অভিনব অবদান দেখিতে পাওয়া যায়। **শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ সাধন** এ কথা সাধনতত্ত্বে বলা হবে।

সাধ্যের শিরোমণি রাধাপ্রেম, এ তত্ত্ব রায় রামানন্দ সংবাদে সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত হবেন। সাধ্য বলিতে আমাদের সম্পূর্ণ জীবন সাধনার চরম লক্ষীভূত পরম বস্তুটি বুঝিতে হইবে। সুতরাং রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি একথা বলার অর্থ হবে এই যে, জীব চরমে ঐ পরমতম সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই জীবনের সম্পূর্ণ সাধনার পরম ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখনই জীবন সাধনার সম্পূর্ণ সার্থকতা সিদ্ধ হইবে ।

> *“জীবের স্বরূপ বলা হইয়াছে — ‘কৃষ্ণদাস’।*
> *‘জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস’।”*

রসিক আচার্য্যেরা বলেন, দাস্যরসের ও মধুররসের একত্র হওয়া বা মিলন ঘটে না। রসের উপাসনায় এই দুইয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব নয়। দাস্যের মধুররসে অধিকার হয় না। শ্রীসীতারামের মিলন সুখের লেশমাত্র কল্পনাও হনুমানজীর পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। চরণসেবক, আজ্ঞাপালক দাসের মধুররসাধিকারিণীর মত সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ, আত্মদানে সামর্থ্য তো দূরের কথা কল্পনাও সম্ভব নয়।

সুতরাং একটি কঠিন সমস্যার উদয় হইয়াছে। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, সে জীবের সাধ্যশিরোমণি যে রাধাপ্রেম, তাঁর আস্বাদন বা আস্বাদনের অধিকার কেমন করে পাইবেন। যে বস্তু যাহার অধিকারের বাহিরে সেই বস্তু তাহার পক্ষে সাধ্য বলিয়া গৃহীত হইবে কোন যুক্তি বলে? আর শুধু শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনে ঐ রূপ দুর্লভ সাধ্য মিলিবে কি

করিয়া?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন মহাপ্রভু আসিয়াছেন **সাধ্যশিরোমণি রাধাপ্রেমরূপী** ধন জীব জগৎকে অকাতরে, অবিচারে, আপামর জন সাধারণকে বিতরণ করিতে। এখন সমস্যা হল, যে দ্রব্যে যাহার অধিকার নাই তাহাদের সেই বস্তু কোন প্রকারে বিতরণ করিবে। তার সার্থকতা কোথায়? নিত্যদাস জীবের দুয়ারে মধুর রসের ভাণ্ডার খুলিবার উপযোগিতা কি? এই সকল জিজ্ঞাসার সমাধান গভীরতর বিষয়ের অপেক্ষা রাখে।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সবার আগে জীবের স্বরূপটি কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। তবেই সমাধানের সুফল পাওয়া যাইবে। শ্রুতিতে কোন-কোন মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা আছে । যেমন কি-

> *“অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি*
> *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম”* ইত্যাদি।

আবার

> *“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।*
> *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণম্ ।। ”*

সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ভগবান বা ব্রহ্ম। বস্তুতঃ সৎ ও চিৎধর্ম্ম দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম একই। জলত্বের দিক দিয়ে যেমন সাগরভরা জল ও এক ফোঁটা জল অভিন্ন। কিন্তু পরিমাণগত ভেদ বিচারে সাগর অংশী, এক বিন্দু জল অংশ ।

ঠিক ঐ রূপ আনন্দ-স্বরূপতার বিচারে ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ। যেমন কি **‘মমৈবাংশো জীবলোকে’** ইত্যাদি বাক্যে গীতায় ভগবান শ্রীমুখে উচ্চ কণ্ঠেই তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীরামচরিতমানসে আছে- *‘ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী, চেতন অমল সহজ সুখরাশি’* অর্থাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্র। ব্রহ্ম ভূমা জীব অণু **(এষঃ অণুঃ আত্মা- মুণ্ডক উপনিষদ)**। যেমন সূর্য্য আর তার কিরণকণা, অগ্নিরাশি আর একটী

স্ফূলিঙ্গ তত্ত্বতঃ এক কিন্তু মাত্রাদৃষ্টিতে প্রচুর ভেদ, ঠিক তেমনিই ব্রহ্ম ও জীবে পার্থক্য ।

আনন্দ আস্বাদনের দিকে দৃষ্টি করিলে আরও ভেদ আছে। তিনি আশ্রয়, জীব আশ্রিত। তিনি প্রভু, জীব দাস। ভূমা ও অণু, অংশী ও অংশ এই ভেদ তত্ত্বগত, প্রভু ও ভৃত্য, সেব্য ও সেবক এই ভেদ রসগত। তত্ত্বের ভিত্তি হইল স্বরূপ, রসের ভিত্তি হইল সম্বন্ধ। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় তত্ত্বগত ভেদের কথাই বড় করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে রসগত ভেদের দিকেই দৃষ্টির প্রাধান্য ।

ভগবদ্ভক্তের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল জীব কেবল অংশ নহে জীব কৃষ্ণের দাস।

"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।
জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"

ইহাও শেষ কথা নহে ।

জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। সুতরাং জীব ও কৃষ্ণের ভেদ হইতেছে শক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে। যাহারা ব্রহ্ম বস্তুকে বিনা শক্তির ভাবনা করেন তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা দেখিবেনই। স্বরূপশক্তির লীলাবৈচিত্র্যময়, ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ উপাসনায় শক্তি দ্বারে জীবের সঙ্গে ভিন্নতা নিত্যই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, কিন্তু তিনটি মুখ্য।

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান ।
'চিচ্ছশক্তি' 'মায়া শক্তি' 'জীব শক্তি' নাম ।,
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা অর্থাৎ মায়া শক্তি এবং তটস্থা শক্তি অর্থাৎ জীব

শক্তি। জীব তটস্থা শক্তি। আবার

'তটস্থত্বঞ্চ উভয়কোটৌ অপ্রবিষ্টত্বদেব।'

জীব শক্তির কোন কোটিতেই প্রবেশ নাই। তবে সেই জীব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে বহির্মুখী অর্থাৎ ভগবৎবিমুখ হয়, আর অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির করুণায় অন্তর্মুখী অর্থাৎ ভগবৎমুখী ভক্ত হয়। স্বরূপশক্তির আশ্রয়ানুগত্যেই জীবের জীবনের পূর্ণতম সার্থকতার উপলব্ধি হয়। সুতরাং অতি রহস্যময় খবরটি হইতেছে এই যে, রসতঃ বিচারে জীব কৃষ্ণদাস নহে, জীব স্বরূপাশক্তি শ্রীরাধার দাসী। যেহেতু জীব স্বরূপশক্তির করুণায় অন্তর্মুখী বা ভগবানের দাসত্ব পায়। আর শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি সুতরাং জীব হইল শ্রীরাধার দাসী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তির বিচারে শ্রীরাধা শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান। শ্রীরাধা শক্তিতে শক্তিমত্তাই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং রসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শ্রীরাধার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর। রাধাদাস্য লাভেই জীবের পরম চরিতার্থতা, এই রহস্যময় নববার্ত্তা শ্রীগৌরহরিই বহিয়া আনিয়াছেন। প্রিয় পার্ষদ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রভৃতির ভজনে ইহা স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত হইয়াছে।

(১) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

'হে দেবি তোমার পাদপদ্মে শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত কোন কালেই অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বে আমার নিত্যই নমস্কার থাকুক, তোমার দাসীত্বেই আমার দৃঢ় অনুরাগ হউক - ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।'

(শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি শ্লোক সংখ্যা ১৬র বাংলা অনুবাদ।)

(২) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ

"অপার রসের সার, শ্রীলব্রজেন্দ্র কুমার
(তাঁর) বিলাসমুরতি রাধারাণী।
সৌম্যশ্রী পরমানন্দ, পাদপের মূলকন্দ
অদভুত রস চিন্তামণি।।
রাধিকার দাস্যানন্দ, রূপ গুণ লীলাবৃন্দ
ব্রহ্মাদির অতীব দূর্গম।
হেন রাধা মদীশ্বরী, বৃষভানু সুকুমারী
জনমে-জনমে নিবেদন ।।
রাধার কিঙ্করী হৈয়া নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা।
ভজোঁ মুই রাধার চরণ ।।
ভণে শ্রীপ্রবোধানন্দ হে ভানুকুল চন্দ।
এই বাঞ্ছা করহ পুরণ।।"

-(শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি শ্লোক সংখ্যা- চল্লিশের পদ্যানুবাদ)

জীবের রাধাদাসীত্বের খবরটি একটী যৎসমান্য কথা মাত্র নহে। জীবের দাসত্ব থাকিবে, মধুররসের আস্বাদনও থাকিবে কেবল মাত্র রাধা দাসীত্বের পরিচয়দ্বারেই ইহা সম্ভব। মধুররস ও দাস্যরসের বিরোধিতা রাধাদাসীরাই সমাধান করিবে। এই মহাসাধনের সন্ধান দিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর যারে তারে উজ্জল প্রেমধন দান করিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপের এই পরিচয়টি নিবিষ্টভাবে অনুধাবনের বিষয় বলা বাহুল্য।

শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত্তি। আগেই বলা হয়েছে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি। আবার স্বরূপ-শক্তির তিন রূপ-

"সচ্চিদানন্দ-ময় কৃষ্ণের স্বরূপ
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' 'সদংশে সন্ধিনী '
চিদংশে 'সম্বিৎ' যারে জ্ঞান করি মানি।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি তিন প্রকার। যেহেতু ভগবান সচ্চিদানন্দময় অতএব সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে 'সম্বিৎ' আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। আর এই হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধারাণী।

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ।।
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী ।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যেহেতু জীব তটস্থা শক্তি, তাই জীবের পক্ষে স্বরূপাশক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর মুখ্য দাসীত্বেত্ত অধিকার নাই। হ্লাদিনীর মুখ্য দাসী যাঁহারা তাঁহারা তাঁহারই অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধারাণীর কায়-ব্যূহ-স্বরূপ। কায়-ব্যূহ-স্বরূপা নিত্যসিদ্ধা সখীগণই শ্রীরাধার মুখ্য দাসী। যেমন কি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে-

"মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়-ব্যূহ-রূপ ।।"

জীব সেই দাসীগণের দাসী। শ্রীরাধা দাসীগণের দাস্যে জীবের মধুররসের আস্বাদন কি রূপে ঘটিবে তাহাই জানিবার জন্য গৌরহরি শ্রীরাম রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এখানে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে-এর আগে বলা হয়েছে জীব মূলতঃ কৃষ্ণদাস নহে, শ্রীরাধার দাসী কিন্তু এখন আবার বলা হচ্ছে জীবের শ্রীরাধাদাসীত্বেত্ত অধিকার নাই। জীব হচ্ছে শ্রীরাধার দাসীর দাসী। এটা মনে রাখতে হবে, কিন্তু আরও গভীর ভাবে আলোচনার পর জীবের নতুন স্বরূপ বের হবে। দেখা যাক -

"প্রভু কহে সাধ্য বস্তুর অবধি এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ।।
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায় ।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ।।"

সখীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বে ঐ সাধ্য লাভ হয়- এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিতে গিয়া রাম রায় প্রথমে রাধাদাসীগণের কি অধিকার ও যোগ্যতা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন। মুখবন্ধে রাম রায় কহিলেন- 'প্রভু ভাল-মন্দ কিছুই জানি না। যাহা কহাও তাহাই কহিতেছি।'

প্রভুর জিজ্ঞাসার বিষয়টী যে অত্যন্ত রহস্যময় তাহা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, এই রহস্যময় কথার বক্তা ও শ্রোতা বিশ্ব সংসারে একজনই আছেন। তিনি '*গৌরসুন্দর* ' নিজেই। তবে আমি রাম রায় যে কিছু বলিতে পারিতেছি, তাহা যন্ত্রীর হস্তস্থিত যন্ত্রের মত ।

"মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ।। "

এই সাধন-রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষেও সুদুর্লভ। প্রহ্লাদাদি হরি ভক্তগণের নিত্য অনুধ্যানের এমন কি ব্রজের শ্রীদামাদি সখাগণের, নন্দ যশোদাদি জননীগণেরও অবিদিত। তথাহি শ্রীরায় কণ্ঠোক্তি।

"রাধা কৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।। "

এই পয়ারে উল্লেখিত '*দাস্য বাৎসল্যাদি* ' ভাবের কথাটি বিশেষ সঙ্কেতপূর্ণ। দাস্যের গোচর নহে, তৎপর বাৎসল্য বলায় মধ্যবর্তী সখ্যও পাওয়া গেল। সখ্যের গোচর নহে, বাৎসল্যেরও গোচর নহে। একথা তো স্পষ্ট হইয়া গেল। বাকী রইল শুধু মধুররস। কিন্তু পরে আবার **'আদি'** শব্দ কেন?

'আদি' শব্দের লক্ষীভূত রসটী কি? মধুররস ছাড়া তো আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আদি পদে **'মধুর'** রসকে গ্রহণ করিলে পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, রাধাকৃষ্ণ লীলা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুররস সকলেরই অগোচর। আর যদি সকলেরই অগোচর হয় তাহলে গোচর হইবে কাহার? এ যেন এক প্রহেলিকা, ব্যাসকূট। আদি শব্দ কেন,

তাঁহার লক্ষ্য কি? তাঁহা যেন বুদ্ধিগত হইতে চায় না। একমাত্র গৌরকৃপাস্নাত ভক্ত ভিন্ন এই সব রহস্যের অর্গল আর কে খুলিতে পারে।

মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান। এক স্বকীয়া মধুর ও অন্য পরকীয়া মধুর। সুরসিক রাম রায় **'আদি'** পদ দ্বারা স্বকীয়া মধুরকে গ্রহণ করিয়াছেন। আশয় হইল এই যে রাধাকৃষ্ণ লীলা স্বকীয়া মধুর রসেরও নাগালের বাইরে। একমাত্র পরকীয়া রসের অর্থাৎ কেবলমাত্র সখীগণের গোচরীভূত। দ্বারকার মহিষীগণের এমন কি বৈকুণ্ঠের লক্ষীগণেরও রাধাগোবিন্দলীলা আস্বাদনে প্রবেশের অধিকার নাই। তবে অধিকার আছে কার? রাম রায় কহিলেন-

"সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।। "

পরকীয়া মধুররসে অভিষিক্ত শ্রীরাধাদাসী সখীগণেরই ইহাতে একমাত্র অধিকার। তাহাদের যে কেবলমাত্র আস্বাদনের অধিকার তাহাই নহে, ঐ লীলাকে বিস্তার করিয়া পরিপুষ্টি সাধন করিবার যোগ্যতা সখীগণের আছে। শ্রীরাম রায়ের কণ্ঠোক্তি প্রভু গৌরহরি শ্রবণ করিতেছেন।

"সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় -
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
সখী ভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ।
রাধা-কৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা-সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।। "

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতকার লিখিয়াছেন (১০/১৭)

"বিভুরপি সুখ-রূপঃ স্ব-প্রকাশোऽপি ভাবঃ।
ক্ষণমপি ন হি রাধা-কৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।।
প্রবহতি রস-পুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ ।
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রস-জ্ঞঃ।। "

"শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব অতি মহান। ইহা পরম সুখস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। তথাপি সখীগণ ব্যতীত রসের পুষ্টি হয় না। সুতরাং কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি সখীগণের চরণাশ্রয় করিবে না অর্থাৎ সকলেরই করা উচিৎ।"

রসগোল্লাটি মুখে দিলে মুখ মিষ্টি রসে ভরিয়া যায়। ইহাতে অপরের সাহায্য লাগে না। তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতি সুখস্বরূপ। তাঁহাদের মিলনেই পরম আনন্দের উদয় হয়। সেই সুখ আস্বাদনের জন্য আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্য, সখীগণের এক অদ্ভুত মহিমা, তাঁহারা ছাড়া ঐ প্রেমের সুখস্বরূপতার অনুভব হইতে পারে না ।

সূর্য্য স্বপ্রকাশ, তাহাকে দেখাইতে আর আলোর দরকার হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্বয়ং স্বপ্রকাশ। উহা সর্ব্বদা সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া বিরাজমানা থাকা উচিৎ। কিন্তু সখীগণের কি যে অবিচিন্ত্য সামর্থ্য তাঁহারা ছাড়া ঐ স্বপ্রকাশ বস্তুরও অভিব্যক্তি হয় না।

এই রূপ হইবার একটি কারণ হইল এই যে শ্রীরাধা এবং নিত্যসিদ্ধা সখীগণ অভিন্না। সখীগণ মহাভাবময়ীর প্রতিবিম্ব স্বরূপা। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা। সখীগণ ঐ লতার পল্লব পুষ্প পাতা।

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা।
সখী-গণ হয় তার পল্লব-পুষ্প পাতা।। "

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সখীগণ স্বরূপাশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহাদের সেবা রাগাত্মিকা ও

স্বাতন্ত্রময়ী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ হইতে ঐ সেবার লালসা। তাঁহারা যেমন ভাবে ইচ্ছা করেন তেমনিই ভাবে যুগলকিশোরের লীলা প্রকটিত করিয়া পুষ্টি বিধান করিতে পারেন। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ললিতা, বিশাখা ও বৃন্দা এই তিনটি সখীর রহস্যময় সেবা সম্বন্ধে কোন অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তকে লিখিয়াছিলেন-

'সখী ললিতা।। ইনি রাধার মন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি প্রেমের কার্য্য করেন। ইনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। কেন না পাছে যদি শ্রীমতী কাঁদিয়া উঠেন এই জন্য। ইনি প্রেমের পথের। ইহার ডাক 'মাধব'। ইনি শ্রীমতীকে 'রাই' বলিয়া ডাকেন। ইনি শ্যামকে রাধামন্ত্রে দীক্ষা দেন। ইনি শ্যামের গুরু আবার দাসীও। সকলের শ্রেষ্ঠ আদিরস। তাহাতে প্রেমে আত্মসুখ বিস্মৃতি। ইহার চেষ্টা, কিসে রাইএর আনন্দ হয়, কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে। ইহার হইল রাইজীবন।'

'বৃন্দা সখী।। ইনি যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি- ভক্তির কার্য্য করেন। ইনি কুঞ্জেতে মিলনের কাজ সমাধা করিয়া যুগলকে শয়ন দিয়া শয়ন করেন। ইনি ভক্তিপথের। ইহার ডাক 'গোবিন্দ'। শ্রীরাধাকে ইনি 'শ্রীমতী' ডাকেন। ইহার চেষ্টা, কিসে যুগল মিলন হবে। ইহার হইল যুগল জীবন।'

'সখী বিশাখা।। ইনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি জ্ঞানের কার্য্য করেন। কুঞ্জেতে ইনি সকলের আগে শয়ন করেন। ইনি অনুরাগিণী। ইহার ডাক 'হরি'। শ্রীমতীকে ইনি 'রাধা' বলিয়া ডাকেন। ইহার চেষ্টা, কিসে রাই শ্যামকে সাধিতে আসিবে।' ইহার হইল কৃষ্ণ জীবন।

স্বরূপাশক্তির বৃত্তিগণ কিভাবে নিত্যকাল সেবা করেন তাহার কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করা হইল। ইহা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের দান।

জীব স্বরূপাশক্তি নহে। শ্রীরাধারাণী অর্থাৎ স্বরূপাশক্তির কায়-ব্যূহ স্বরূপা সখীগণও নহে। সুতরাং তাহাদের মত সেবায় কোন কালেই অধিকার হইবে না। আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসীর যোগ্যতা। রাগাত্মিকা সেবার আনুকূল্য-বিধান-রূপ সেবাতেই জীবের অধিকার। রাগাত্মিকা

সেবার আনুগত্যময়ী সেবাই রাগানুগা। সাধক নিজেকে শ্রীরাধার দাসীর দাসী স্বরূপে স্থিত করিয়াই এই রাগানুগা ভজন করিয়া থাকেন। রাগানুগামার্গে সখ্য বাৎসল্য রসের আনুগত্যময়ী সেবাও হইতে পারে। এখানে সাধ্যশিরোমণি রাধা ভাবের প্রসঙ্গ বলিয়াই অন্য রসের বিষয় আলোচনার বাহিরে থাকিতেছে।

সেবার প্রকার ভেদে শ্রীরাধা দাসীগণের দুই প্রকার ভেদ - সখী ও মঞ্জরী। সখীগণ রাধা কল্পলতার পত্রপুষ্প-স্থানীয়া, আর মঞ্জরীগণ লতার জীবনী-শক্তি-স্বরূপা। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ মঞ্জরী-গণের স্বরূপ বিচারে লিখিয়াছেন-

'স্ব-সুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ - চেষ্টা।'

শ্রীরাধার আনন্দ চেষ্টার মূর্ত্তবিগ্রহ মঞ্জরীগণ। 'স্ব-সুরত-বিমুখা' কথাটি বিশেষ ভাবে বিচারণীয়। সখীগণের স্বভাব বর্ণনায় শ্রীরাম রায় এক অকথ্য কথন কহিয়াছেন-

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন।।"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে মিলিত হইয়া যে আনন্দের আস্বাদন করা যায়, তাহা কোন সখীই কামনা করেন না। তাহারা সদা সর্ব্বদাই তৎ-সুখ-সুখিত্ব-ভাবনায় অবস্থিত। তাহাদের একমাত্র চাহিদা 'কৃষ্ণসুখ'। স্বসুখ বাঞ্ছার বালাই নেই।

সংসারে সকলেই কৃষ্ণকে চায়। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে চায়। কিন্তু সখীরা তাহা চান না। তাঁহারা কৃষ্ণকে চান না। কৃষ্ণ-সঙ্গও চান না। তাঁহারা চান কৃষ্ণসুখ। তাঁহারা মনে করেন আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার যে সুখ হইবে তদপেক্ষা অধিকতর সুখের উদয় হইবে শ্রীরাধা-সহ মিলিত হইলে। এই জন্য তাঁহারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মিলন করাইয়াই নিজ মিলন অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ-সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাতে কোটি সুখ পায়।।
কৃষ্ণ-লীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

একে বলে ভাবোল্লাসারতি অর্থাৎ যুগল-মিলনে যুগল যে আনন্দের আস্বাদন করছেন তার ভাবোল্লাসে সখীরাও সেই আনন্দ শত কোটিগুণ আস্বাদনে সক্ষম হইতেছেন।

এই প্রকারে নিজ-সুখ বাসনার গন্ধমাত্রবর্জ্জিত কোন নায়িকা হইতে পারে ইহা কল্পনা করাও কঠিন। তাই গোপিকার অর্থাৎ সখীদের স্বভাব অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীরাধিকার প্রেমেও বিন্দুমাত্র নিজ সুখের অভিলাষ নাই। তিনি যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, তাহা একমাত্র কৃষ্ণেরই সুখের জন্য। তাই শ্রীরাধাও কখনও-কখনও মনে করেন যে তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণকে যে সেবা সুখ দিতেছেন, তদপেক্ষা অধিক সুখ তাহাকে অন্য সখীগণ বা গোপিকাগণ দিতে পারে। সেই জন্য সখীর স্বাধীন-ভাবে কৃষ্ণ-সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা না থাকিলেও শ্রীরাধা নানা প্রকার যত্ন করিয়া বা ছল করিয়া সখিগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সাধন করেন। ঐ রূপ করিয়া নিজ কৃষ্ণসেবা হইতে কোটিগুণ অধিক সুখ-ভোগ করেন। যেমন কি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাকার লিখেছেন-

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ।।
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায় ।।"

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ছল করিয়া সখী সন্নিধানে প্রেরণ করেন। তাহাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করেন। যে সখীদের সম্বন্ধে এই কথা

বলা হইল তাঁহাদের নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিত হইবার ও স্বাধীন-ভাবে সুখ-বিধান করিবার যোগ্যতাও আছে। লতার অঙ্গ-প্রতঙ্গ হইলেও পত্র-পুষ্পের কিঞ্চিৎ নিজ স্বাতন্ত্র্যও আছে। তদ্রূপ সখিগণের নিজ স্বতন্ত্র অধিকার বা যোগ্যতা আছে। তাঁহারা ঐ অধিকার বা যোগ্যতার ব্যবহার করিতে চাহেন না। তথাপি শ্রীরাধা করান। এই কথাই এখানে বলা হয়েছে।

কিন্তু এই বিচারে সখিগণ সঙ্গে মঞ্জরীগণের পার্থক্য। মঞ্জরীগণ সর্ব্বতোভাবে *'স্ব-সুরত বিমুখা '* শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে মিলন বিষয়ে তাহারা একান্ত-ভাবেই বিমুখ। তাহাদের যেন ঐ অধিকার বা যোগ্যতাই নাই। পত্রপুষ্পের লতা ছাড়াও সত্তার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ লতা ও পত্র-পুষ্পকে আলাদা করেও দেখা বা জানা যেতে পারে কিন্তু লতার জীবনীশক্তির লতা ছাড়া বিদ্যমানতাই নাই। জীবনীশক্তি দ্বারেই লতার জীবন। কাহারও পৃথক হইবার যোগ্যতা নাই। যেন সূর্য্য ও সূর্য্যের রশ্মি, আগুন ও দাহিকা শক্তি - একে অপরের পার্থক্য হয় না।

শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার রূপের মূর্ত্তি। শ্রীরসমঞ্জরী শ্রীরাধার রসের মূর্ত্তি। শ্রীগুণমঞ্জরী শ্রীরাধার গুণরাশির ঘনমূর্ত্তি। রতিমঞ্জরী শ্রীরাধার কৃষ্ণরতির বিগ্রহস্বরূপিণী। রাগমঞ্জরী শ্রীরাধার অনুরাগের ঘনীভূত প্রতিমা। বিলাসমঞ্জরী শ্রীরাধার বিলাসের প্রকট বিগ্রহ। নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণ সকলের স্বরূপই এই প্রকার অভিন্ন স্বরূপ।

লতার রূপ-রস-গুণ যেমন লতা হইতে একেবারেই পৃথকভূত হইতে পারে না, তদ্রূপ মঞ্জরীগণেরও শ্রীরাধা হইতে পৃথকভাবে অবস্থিতিরই সম্ভাবনা নাই। শ্রীরাধা হইতে পৃথক-ভাবে কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার যোগ্যতা, সখীগণকে নিভৃত সেবা-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অযোগ্য করে। পক্ষান্তরে রাধা হইতে পৃথকভাবে কৃষ্ণ-সহ মিলিত হইবার অযোগ্যতা মঞ্জরীগণকে গূঢ় সেবা বিষয়ে অধিকতর যোগ্য করে।

অতএব অন্তরঙ্গ সেবায় সখী অপেক্ষা মঞ্জরীগণের অধিকার অনেক বেশী। সখীগণ হইতে মঞ্জরীগণ বয়সে ন্যূন অর্থাৎ ছোট। শ্রীরাধা

গোবিন্দের নিভৃত মিলনকালে সখীগণ কিছু সময় গবাক্ষ পথে দর্শনের অধিকার পাইয়া থাকেন। তারপর নিজ-নিজ কুঞ্জে বিশ্রামার্থ গমন করেন। কিন্তু মঞ্জরীগণ ঐকালেও কুঞ্জমন্দিরে অবস্থানপূর্বক উভয়ের মিলন আনন্দের সংপুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন।

মঞ্জরীগণের সমক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ নিঃসংকোচে নিভৃত নিকুঞ্জে বিলাসাদি করিয়া থাকেন এবং ইহারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ই অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকারিণী। ইহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যিক কোন প্রকার রতি বিলাসাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসাদি দর্শনে এই ভাবময়ীদের দেহে রতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক নিগূঢ় নিরুপম রহস্যময় বার্তা। এই মঞ্জরীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বেই জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরাকাষ্ঠা অবস্থা বিরাজিত। তবে এই নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণের দাসীত্বও সোজাসুজি যে কোন জীব পেতে পারে না। একমাত্র গুরু ও আচার্য্যকোটির জীব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তাঁহাদের কৃপায়ই সামান্য জীব এই দাসীত্ব স্বীকার করতে সক্ষম হয়।

এইরূপ গুরুরূপা মঞ্জরীর দাসীত্ব স্বরূপটি জীবের যথার্থ। ইহা কাল্পনিক কিছু নহে। কাল্পনিক নহে বলিয়াই ভাবনা দ্বারা ইহার স্ফূর্ত্তি ও অনুভূতি হইতে পারে। যেমন একটি লোক বঙ্গ দেশের বাঙ্গালী, সে বাঙ্গালীও এবং ভারতবাসীও। তবে সে যে বাঙ্গালী ইহা সে সর্ব্বদা জানে কিন্তু সে যে ভারতবাসী ইহা ভুলেও মনে করে না। মনে না করিলেও সে যে ভারতবাসী ইহাতো সত্যই, কাল্পনিক কিছু নয়। কাল্পনিক নয়, সত্য বলিয়াই সে যদি পুনঃ-পুনঃ নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবনা করে, ভাবিতে-ভাবিতে এক দিন ঐ অনুভবে নিশ্চয়ই স্থিত হইতে পারিবে বাঙ্গালী ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া ভারতবাসী হইয়া যাইবে।

তাই, সনাতন শিক্ষায় মহাপ্রভু রাগানুগা সাধনের রহস্যময় পন্থা বলিতেছেন-

" মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।"

সিদ্ধ দেহ বলিতে গুরুরূপা মঞ্জরীর দাসী-অভিমান-বিশিষ্ট দেহ। এই দেহ জীবের সচ্চিদানন্দময় মাধুর্যঘন দেহ। ইহা তার আছেই আছে। এতৎসম্বন্ধে কোন ভাবনা সে করে না বলিয়াই, নাই বলিয়া মনে হয়। মনে-মনে ঐ নিজ দেহের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই জন্য এই দেহকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলা হয়। এই দেহই গোপীদের প্রেমঘন ভাবদেহ, যে গোপীরা শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বিস্তারে সহায় হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীহরিকথায় লিখিয়াছেন-

"গোপীভাব লওরে
গুরুগতি, কৃষ্ণপতি ।"

এই স্থলে গুরুপদে গুরুরূপা মঞ্জরীর কথা বলা হইয়াছে। মঞ্জরীর আশ্রয় লইয়া তাঁহার দাসী অভিমানে কৃষ্ণপতির সেবা করিতেছি এই মত ভাবনা করিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছেন-

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া ।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হইয়া ।।"

যিনি মনকে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের ভাবনায় নিমজ্জিত করিতে পারিয়াছেন তিনিই অন্তর্মনা। অন্তর্মনা হইয়া সাধক নিজ প্রিয়তম যে কৃষ্ণ, তাঁর যে প্রিয়তমা ও পরম গুরুরূপা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি, শ্রীগুরু আনুগত্যে তাঁহাদের পাছে-পাছে থাকিয়া অনুগত হইয়া 'লাগিয়া' রহিয়া সেবা করিতে হইবে।

তথাহি শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুসুন্দরের পদ-

"গুরুরূপা সখী বামে নেহারি নয়নে।
নিরবধি রহিব চরণ সেবনে।।
ভণে জগদ্বন্ধু দ্বিজ কবে দোহঁ মুখাম্বুজ
হেরিব সখীর পাশে বসি।।
(সখীর পাশেতে রহি) (মঞ্জরীর হাত ধরি)
(অশ্রুনীরে অঙ্গ ভরি) (হেরব যুগলরূপ মাধুরী।।)"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অভিনব আস্বাদনের এই- রহস্যময় সাধনের কিঞ্চিৎ দিকদর্শন করা হইল মাত্র। পরে সাধন-তত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনকে সাধন বলা হইবে। এই রাগমার্গীয় ভজনে তাহার স্থান কোথায় এ সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোক্তি-

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন।"

বাহ্যদেহের শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সাধনের সহিত সিদ্ধদেহের আনুগত্যময়ী সেবা-সাধনার একটী গূঢ় যোগাযোগ আছে। যোগটি সিদ্ধ হয় লোভের দ্বারে। যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ অনুরাগ আছে এমন ভক্তের মুখে ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রেমময় লীলাকথা শ্রবণ করিতে-করিতে তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য যদি কাহারো চিত্তে লোভের উদয় হয়, "সেই গোপীভাব অমৃতে যার লোভ হয়" সেই ব্যক্তিই রাগানুগামার্গে তাঁহাকে ভজন করিতে পারে। লোভ উৎপত্তির মাধ্যমে অন্তর-বাহ্য সাধনের সম্পর্ক।

বাহিরে সাধক দেহের ভজন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কোন প্রিয়জনকে বলিয়াছেন-

"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও।"

বাহিরের সাধনে প্রিয়তম "আপন" হইবে। অন্তরের ভজনে আপনজনের সেবায় আনুগত্যময়ী তন্ময়তা আসিবে। মঞ্জরী চাহেন শ্রীরাধার সুখ। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণ সুখ। সাধক রাধাদাসী গুরুরূপা মঞ্জরীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিবে। আনুগত্যময়ী একাত্মতায় কিশোরীসঙ্গে কিশোরের নিত্য মিলনানন্দ আপনি আস্বাদন করিবে।

বাহ্য ও অন্তর ভজনের এর থেকেও বেশী গভীরতর যোগাযোগ

আছে। বহিরঙ্গ নামকীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ রস-আস্বাদন এই দুইকে মহাপ্রভু ওৎপ্রোত ভাবে মিলাইয়া রহস্যময় এই সাধ কে অখণ্ড রূপ দিয়াছেন।

" নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।"

সাধন "নাম" ও সাধ্য " রাধা প্রেম" এই দুইকে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখণ্ডরূপতা আধান করিয়াছেন শ্রীগৌরহরি। এই আধানের সচল বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। তিনি এই রসের আস্বাদন স্বয়ং করেছেন ও জগৎজনকেও তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। প্রভুর লীলায় আমরা দেখতে পাই এই দুইএর কি মধুর ভাবে তিনি আস্বাদন ও বিস্তার করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে দেখিয়েছেন ব্রহ্মচর্য্য পালনের অনিবার্য্যতা। তারপর হরিনামের কীর্ত্তন বা আস্বাদন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও হরি নামই প্রভুর সার্ব্বজনীন বাণী। কিন্তু এরও আগে যিনি যেতে চান তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হতে-হতে শ্রীরাধা প্রেমের রসের ভূমিতে উপনীত হবেন। তখন শ্রীরাধাই হবেন জপতপ, কীর্ত্তন, ভজন, সেবা আরাধন, একাধারে সব কিছু। শ্রীরাধানাম জপ ও কীর্ত্তন। শ্রীরাধাই একমাত্র আশ্রয়। শ্রীরাধা সন্নিধানে যুগলের সেবা- যুগল-মিলন প্রীতিরসের অবিচ্ছিন্ন আস্বাদন। সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় হবে শ্রীরাধার। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা একমাত্র শ্রীরাধা দাস্যাশ্রয়। যেমনকি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ উল্লেখ করছেন- শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধিতে শ্লোক সংখ্যা ৯৫ ও ২৪১ - যথাক্রমে তার **পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হল-**

"রাধা এই দুটী বর্ণ রসামৃতে পরিপূর্ণ
জগজন আহ্লাদক নাম।
গোকুল পতির মন নামে করে আকর্ষণ
সুমধুর রসায়নধাম।
জপিতে জপিতে রাধা নাম মহামন্ত্র সদা,
নামে করে প্রেমের উদয়।
পুরুষার্থ যত হয় অপদার্থ মনে লয়-
রাধা নাম হেন মধুময় ।।

রাধা নামাঙ্কিত মন্ত্র মন্ত্র চূড়ামণি তন্ত্র
জপ করে প্রীতে শ্রীমাধব।
প্রবোধানন্দেতে ভণে স্ফূর্ত্তি হউক মোর মনে,
রাধা নাম পরম সম্পদ ।। ৯৫ ।।"

"তোমার উচ্ছিষ্ট রাধে অমৃতের সার।
ভোজনেতে চিত্তশুদ্ধি হইল আমার।।
মধুর শ্রীমধুর লীলা অমৃতের পুর।
শ্রবণে পবিত্র হইল দুটি কর্ণ মোর।।
পাদপদ্ম রজকণা করিয়া সেবন,
শুদ্ধ হৈল সুকুমারী মোর প্রাণমন।
কেলিকুঞ্জে নিরন্তর বিচরণ করি,
এ দেহ পবিত্র হইল নবীনা নাগরী।।
রসময় দিব্যগুণ করিয়া কীর্ত্তন
পবিত্র হইল মোর বাগিন্দ্রিয়গণ।।
শ্রীবিগ্রহ চিত্রপট করিয়া দর্শন
নির্মল হইল মোর এ দুই নয়ন।।
সংসার বিষয় ভোগে যে লালসা মোর
অপার করুণাময়ী সব হৈল দূর ।।
সর্ব্বভাবে তনু মন করিয়া অর্পণ ।
চরণে শরণাগত এই অকিঞ্চন ।।
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ কহে করজোড়ি
দাস্যদানে বাঞ্ছাপূর্ণ করহ কিশোরী ।। ২৪১ ।।"

পূজ্যশ্রীশ্রী পণ্ডিত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ

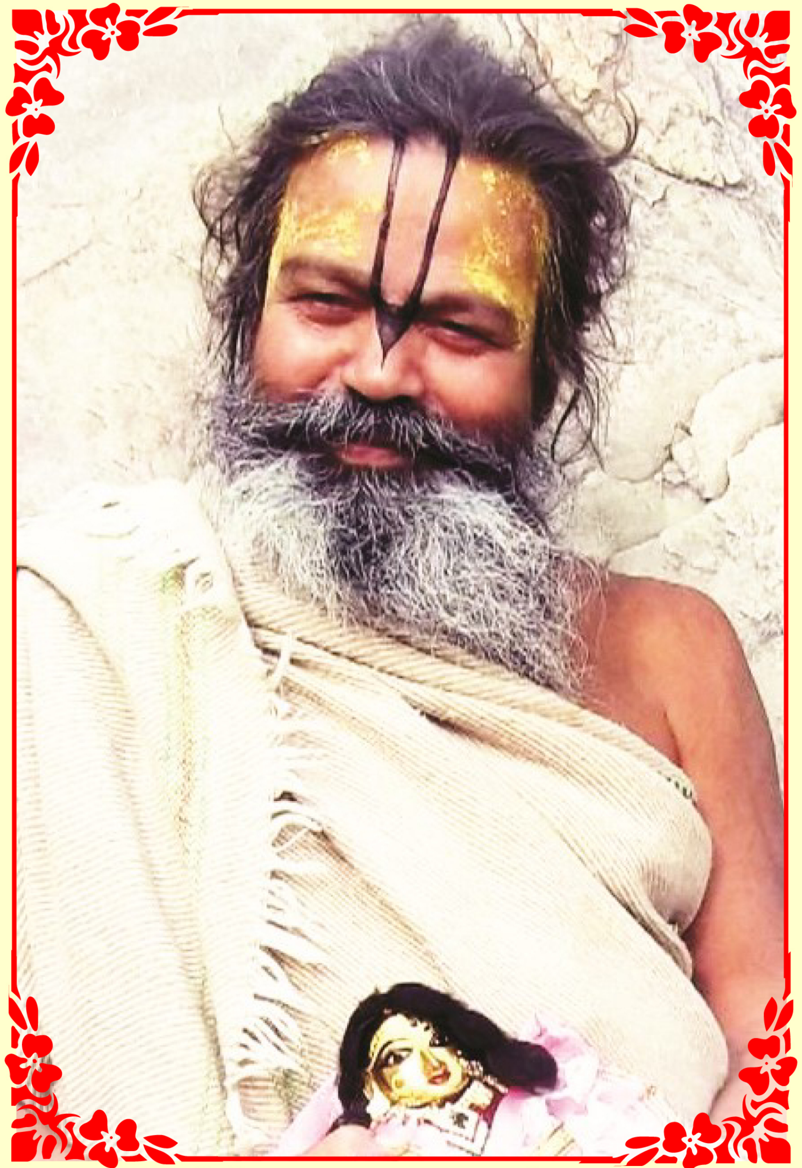

পূজ্যশ্রীশ্রী বিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ

জয় শ্রী রাধে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও প্রেমধর্ম্ম

এই যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বাড়িয়াছে, আত্মিক ক্ষুধা মরিয়া গিয়াছে। ভোগবিলাসের অপরূপ অপার ভাণ্ডার। লক্ষ-লক্ষ বিপণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে কিন্তু আত্মার মহদ্‌গুণ সমূহ মৃতকল্প হইয়া মানব সভ্যতাকে সাহারা মরুতে পরিণত করিতেছে- বর্ত্তমান যুগের এটাই বড় সমস্যা, সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। মানুষে-মানুষে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের অতি নিকট কিন্তু ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়া মানুষ মানুষ হইতে দূর অতি দূর। দেহ কাছে প্রাণ দূরে। মানুষে-মানুষে ঠেকাঠেকি প্রাণহীন যন্ত্রের মত ধাক্কাধাক্কির তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যই সমাজে অশেষ প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কোথায় ইহাই এ যুগের মৌলিক জিজ্ঞাসা।

আজিও এই বর্ত্তমান যুগসমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে পাঁচশত বছর পিছিয়ে যেতে হবে যখন একজন প্রাণের মানুষের জন্য একজন হৃদয় জুড়ান সুহৃদের জন্য গোটা জাতি যেন ছটফট করিতেছিল, তখন আসিয়াছিলেন নদীয়ার ভূমিতে এক মহাসমন্বয়ের মূর্ত্তি। তিনি আসিয়াছিলেন নদীয়ায় কিন্তু ছিলেন তিনি সারা বাংলার, সারা ভারতের, সর্ব্ব মানুষের। বর্ত্তমান মহাসমস্যার সমাধান পাইতে হইলে নানা কোলাহলে চাপা পড়া নদীয়ার বাণীই আবার কান পাতিয়া শুনিতে হইবে।

নদীয়ার বিশাল বাণী একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলা চলে। সেটি হল প্রেম। এই একটি বস্তুর অভাবে সবদিক শূন্য। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া ত্রিলোক শিক্ষাগুরু সনাতন-পুরুষ শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে তাই সনাতনী বাণী শুনাইয়াছেন। শুনাইয়াছেন একটি নিগূঢ় সংবাদ- "প্রেম প্রয়োজন।"

যুগ সমস্যায় ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত সমাজ যদি মহামিলনের স্নিগ্ধ শান্তির

আলোক চাহে তাহা হইলে নদীয়ার ঐ ঠাকুরটীর চরণ প্রান্তেই পাইতে হইবে। এই শতাব্দীর (বিংশতি) প্রারম্ভে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাঁহার ভক্তগণ-সহ দুস্থ জগৎ-জীবের দুয়ারে এই মহাবাণীই ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা যেন তাহা উপেক্ষা না করি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষ লাভ করিয়া প্রেম-ধনে যে ধনী হইয়াছে তাহার কাছেই-

" বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে
বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে।"

বিধি মহেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকেও তুচ্ছ করিয়া বিশ্বকে সুখময় করিয়া তুলিতে করুণাসমুদ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষই উন্মার্গগামী আমাদের পরম সম্বল হউক। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অহিংসাসুন্দর, মানবপ্রেমিক সুশীতল আচরণই একমাত্র অবলম্বন হউক।

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা এমন একটা কথা লইয়া দার্শনিক কথার উপক্রমণিকা করিযাছেন, যে সম্বন্ধে কাহারও সংশয়ের অবসর নাই। অবিবাদিত, সর্ব্বজন স্বীকৃত সেই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটি হইল- "জীবনে দুঃখ আছে।"

জীবনের মধ্যে দুঃখ আছে- এই কথায় আপত্তি তুলিবার কোনও লোক নাই। সবাই বলিবে যে- "দুঃখ আছে" এ কথাটা ঠিকই। ইহার সঙ্গে আরও একটা কথা ঠিক যে দুঃখ কেহই চায় না। শ্রুতিমন্ত্র বলিয়াছেন- ***"দুঃখং মে মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ"***- ইহা সকল জীবের অন্তরের লালসা ***"দুঃখ না হউক"***- এই সঙ্গে ***"সুখ হউক"*** কথাটি আছে। কারণ আমাদের জীবনে দুঃখই একটা সুখের সংবাদ বহিয়া আনে। দুঃখ যে মানুষ ভোগ করে ইহার গূঢ় হেতু হইল যে কোথাওনা কোথাও সুখের সন্ধান আছে। আমাদের জীবনের দুঃখানুভূতিও একটা বিপুল মহত্ত্বের সন্ধান আনিয়া দেয় যে, বিরাটের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। তার যোগ হলেই হয় সুখানুভূতি। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন- ***"নাল্পে সুখমস্তি। যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য "।***

অল্পে সুখ নাই। খণ্ডে আনন্দ নাই। ভূমাই সুখের আকর। অখণ্ডের মধ্যেই আনন্দ। বৃহত্তমের সঙ্গে যে যোগসম্বন্ধ, অখণ্ড ভূমানন্দের সঙ্গে যে ভাববন্ধন, তাহারই নাম ***"প্রেম"।*** প্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রেম ছাড়া কোন ধর্ম্ম নাই। অ-প্রেমের ভিত্তিতে সংসারে কোন ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই। কেবল তাহাই নহে, কোন ব্যষ্টিজীবন বা সমষ্টিজীবন প্রেম ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। যে ধরিয়া রাখে সে-ই ধর্ম্ম। প্রেমই ধরিয়া রাখে। অতএব প্রেমই ধর্ম্ম। প্রেমশূন্যতাই অধর্ম্ম।

সংসারে যত বস্তুর প্রয়োজন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন প্রেমবস্তুর। ইহাই জীবনের চরম প্রয়োজন। এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রয়োজনীয় প্রেমসম্পদ যিনি দান করেন তিনি শ্রেষ্ঠদাতা। যিনি অকাতরে সর্ব্বজনে দান করেন তিনি দাতা-শিরোমণি, তিনিই প্রকৃত জীব-দরদী। ঐ রূপ জীব-দরদী বদান্য শিরোমণি আমরা মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে। পরে ঠিক একশ বছর আগেও ঐরূপ জীব-দরদী আমরা দেখতে পাই, প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের রূপে, যিনি আপামর জনসাধারণের ভিতর প্রেমমূর্ত্তি রূপে বিরাজিত ছিলেন। এমনকি ফরিদপুরের বুনো-বাগদী ও কোলকাতার ডোম পল্লীকেও উদ্ধার করেছেন- নাম ও প্রেম বিতরণের মাধ্যমে। প্রেমের স্বরূপ কি এবং মহাপ্রভু কেমন করিয়া বদান্য শিরোমণি, আমরা এই কথা ক্রমশঃ অনুশীলন করিব।

প্রেম এক প্রকার ভাববন্ধন। ঐ বন্ধনের একটী বিশেষণ হল- **"ধ্বংস রাহিত্যং"**। যে ভাব-বন্ধনে ধ্বংস নাই তাহাই প্রেম। তাই ভৌম বস্তুতে প্রেম হয় না। যাহা ভূমা তাহাই প্রেমের বিষয়। যাহা অপ্রাকৃত তাহাই প্রকৃত প্রেমের আশ্রয়, নির্ম্মল, নির্দোষ আনন্দ রসের ভূমি। সে ভূমি কোথায়? প্রেম বা রসের অবস্থানই বা কোথায়?

প্রেম ও প্রত্যেকটী রসের অখণ্ড বিলাসভূমির নাম ব্রজ। ব্রজই অমৃতময় শাশ্বত ভূমি, ভূমানন্দের নিত্য বিহারভূমি। ব্রজপ্রেমের কোন হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়াই নাশ নাই। ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও

ধ্বংস নাই। ***"সত্যপি ধ্বংসকারণে নিয়ত ধ্বংসরাহিত্যং"।*** এই প্রেমের লক্ষণ ব্রজেই পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত। ব্রজতত্ত্বটি কি এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি এবং কেমন করিয়াই বা তিনি এই ব্রজপ্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরেরই বা কি অবদান তাহাই ক্রমে আলোচিত হইবেন।

পূজ্যশ্রীশ্রী গয়াপ্রসাদজী মহারাজ

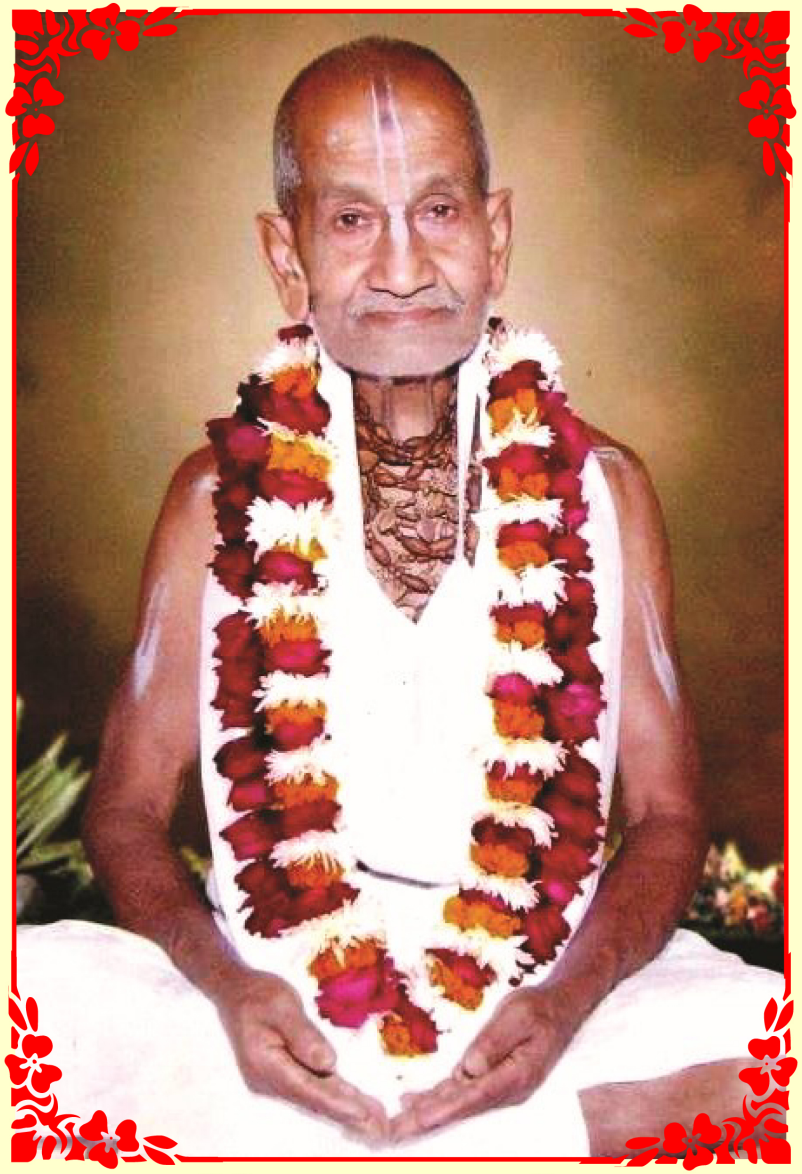

পূজ্যশ্রীশ্রী প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

জয় শ্রী রাধে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও ব্রজতত্ত্ব

সপ্তশতী চণ্ডী বলিয়াছেন-*“দেবাসুরমভূদ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।”* একশত বৎসর ধরিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে।

একশত বৎসর একটি মানুষের পূর্ণ আয়ূষ্কাল। সঙ্কেতে যেন বলিতেছেন- সারা জীবন ধরিয়াই লড়াই চলিতেছে। দৈবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদের সংঘর্ষ জীবন ভরিয়া লাগিয়াই আছে। এই যুদ্ধ কোন ক্ষেত্র বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ।

ভাবুক চিত্তে জিজ্ঞাসা জাগে- যুদ্ধই কি বিশ্বজগতের চরম সংবাদ? ভারতীয় ঋষিরা কিন্তু এই কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা এই যুদ্ধের মধ্যে বসিয়াই মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন-*“মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।”* ইহা এক আশ্চর্য্য বিষয়। ইহা যেন যুদ্ধকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। ইহার মর্ম্মোদঘাটন করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যুদ্ধটা কিসের জন্য? যুদ্ধই কি যুদ্ধের সার্থকতা! যুদ্ধ করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি, একথা জগতের মানুষ শুনিতে চায় না। যুদ্ধের ফলে কোথাও শান্তি হইবে এই আশা আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকিত তবে কেহ যুদ্ধ করিত না। সুতরাং যুদ্ধ একটা যুদ্ধবিহীন অবস্থার সংকেত করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ব্রজের বাঁশরীর রেশ চলিয়া আসে। গীতা ভাগবতের বার্ত্তা বহিয়া আনে। জীবনের কুরুক্ষেত্রেই কালিন্দীকূলের ধীরসমীরের জন্য আকুল আগ্রহ জাগায়।

মানব জীবনের দুইটি ভূমি। একটী কর্ম্মের ভূমি, একটি রসের ভূমি। ইহার নিগূঢ় হেতু হইল এই যে পুরষোত্তমের লীলাজীবনেরও দুইটি ভূমি আছে- একটী কুরুক্ষেত্র অপরটি বৃন্দাবন। যুদ্ধের গান নিজে শুনিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। যুদ্ধের গানটী গীতায় প্রকটিত। *“মামনুস্মর যুদ্ধ চ ”* ইহাই গানের ধ্রুবপদ *“যুদ্ধ কর কিন্তু আমাকে স্মরণ করিতে করিতে কর।”* গীতার গান শুনিতে-শুনিতে ব্রজের বাঁশরীর রেশ কানে আসিবে।

তোহি মাঁগি মাঁগনো ন মাঁগনো কহাও। সুনি সুভাব শীল সুজশ জাঁচন জন আয়ো ।।

বৃন্দাবনের পরম সংবাদ শুককণ্ঠে ভাগবতে উচ্চারিত হইয়াছে। সেখানে সবই স্বচ্ছন্দতাপূর্ণ সবই ছন্দোময়। কথা নাই কেবল গান। গীতার উপদেশ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগে পর্য্যবসান, ভাগবতের বাণী ঐ তিনের মিলনময় নবায়মান নবছন্দে পর্য্যাপ্ত। ঐ একই ছন্দ বিশ্ব প্রকৃতিতে ব্যক্ত, শোভাময় কুঞ্জকাননে। জীবন প্রকৃতিতে ব্যক্ত, প্রেমময় আত্মসমর্পণে। নিত্য ব্যবহারে ব্যক্ত, নৃত্যে, গীতে, সঙ্গীতের আলাপনে।

জীবন যুদ্ধের সার্থকতা স্নেহের মিলনে। গীতার বাণীর চরিতার্থতা মুরলীর মূর্চ্ছনায়। স্নেহের রাজ্য আছে বলিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র আছে। সৃষ্টি সংসারে এই কর্মশালা ব্যর্থ নয়, অর্থপূর্ণ একমাত্র ব্রজের জন্যই। কুসুমে যাহা হাসি রূপে গলিত, পিক-কণ্ঠে যাহা সুররূপে ঝঙ্কৃত, মানব হৃদয়ে তাহাই স্নেহধারারূপে প্রবাহিত। এই প্রবাহের মূল উৎস মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বিরাজিত। সেই কেন্দ্রভূমিই *“ব্রজ।”* বিশ্বকেন্দ্রের স্নেহ-রসের ভূমিই ব্রজ। এই ব্রজতত্ত্ব নিত্য শাশ্বত। ইহা অনন্ত কালই আছে। আছেই আছে, কোন সংশয় নাই। সংসারে স্নেহপ্রীতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার শাশ্বত ভিত্তি আছেই আছে। ব্রজের প্রীতি-ভূমির সঙ্গে জগতের প্রীতি-ভূমির কিছু সাদৃশ্য আছেই। জাগতিক প্রীতি স্বার্থভরা, বিনাশশীল, পাঞ্চভৌতিক দেহনাশে নাশ হয়। আর ব্রজের প্রীতি অতি মহান, স্বার্থ-গন্ধহীন, চির-অমৃতময়, নিত্য-অমরণধর্মী।

অনিত্য জগতের জীব নিত্য নিরন্তর ব্রজকে অনুসন্ধান করে। সকলেই করে, সর্ব্বদাই করে, নিজ অজ্ঞাতসারেও করে। প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা করে যে তাহার প্রিয়জনের স্নেহ প্রীতিতে কোন দোষ না থাকে, আত্মসুখ কামনা না থাকে। ইহা কদাপি সর্বতোভাবে হয় না, তবু কিন্তু লোক কামনা করে। যতটুকু হয় ততটুকু শান্তি মানুষ লাভ করে।

কেহই নিজ প্রিয়জনকে অসুন্দর দেখে না। অমৃতময় চিরসুন্দরকেই জীব প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করে। হৃদয়ের স্নেহ প্রীতি সেই পরমামৃতময় চিরসুন্দরকেই অনুসন্ধান করে। মানব তাহার জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যতখানি ব্রজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ততখানি শান্তি সে প্রাপ্ত হয় ও প্রদান করে। যতখানি ব্রজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

নারায়ণ হরি লগন মে য়ে পাঁচো ন সুহাত। বিষয় ভোগ নিদ্রা হঁসী জগৎ প্রীতি বহুবাত।।

যায় ততখানি দুর্দ্দৈব বেদনাহত হয় ও অপরকে করে।

অতএব জীবের বেদনা ঘুচাইতে হইলে তাহাকে ব্রজমুখী করিতে হইবে। জীবকে চিরশান্তির অধিকারী করিতে হইলে তাহাকে নিত্য ব্রজের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দিতে হইবে। মানব জাতির শান্তি কামনায় যত সাধু মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ চেষ্টা করিয়াছেন সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে অনিত্য জীবজগতের সঙ্গে ব্রজের ব্যবধান দূর করিবার সাধনা করিয়াছেন। যিনি যতখানি পূর্ণাঙ্গভাবে ব্রজতত্ত্ব আস্বাদন ও ব্রজভাব বিতরণ করিয়াছেন তিনি ততখানি মহান, তত বিরাট বিভু, ততখানি বড়, মহা-মহাপ্রভু। এ পর্য্যন্ত যত সাধুসজ্জন, মহদ্ব্যক্তি অবতার পুরুষ জীবজগৎকে ব্রজের কাছে আনিয়াছেন তন্মধ্যে সকলের শীর্ষস্থানে বিরাজমান শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্বাঙ্গীণ ও পূর্নাঙ্গীণভাবে ব্রজকে সর্ব্বাধিক জীবের গোচরীভূত করিয়াছেন মহাপ্রভুই। গৌরহরি ব্রজের গূঢ়ধন আপনার মধ্যে প্রকট করিয়াছেন, নিভৃত নিকুঞ্জের নিগূঢ় বার্ত্তা নদীয়ার মুক্ত আকাশতলে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঁচশত বছর আগে করিয়াছেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঠিক তদ্রূপ একশত বছর আগে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও ব্রজের সম্পদকে কেমন করিয়া আপন করিয়া পাইতে হয়, আস্বাদন করিতে হয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দেখুন তিনি কি বলছেন-

"আয় সবে ভাই,
খোল করতালে, আনন্দে হরিগুণ গাই রে।
আয় হরি বলে বাহুতুলে নাচিয়া বেড়াই রে।।
(ও ভাই) হরে কৃষ্ণ হরে হরে গাও সবে প্রাণ ভরে রে।
(আয়) হরি নামে মাতি প্রেমে ধুলাতে লুটাই রে।।"

ব্রজভারের চরম প্রাপ্তির পরম ভূমিকার নাম সাধ্যতত্ত্ব। সেখানে পৌঁছিবার পথের পাথেয় সংগ্রহের প্রচেষ্টার নাম সাধনতত্ত্ব। এইবার আমরা মহাপ্রভুর দেওয়া সাধনতত্ত্ব ও পরে সাধ্যতত্ত্ব আলোচনা করিব এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অবদান আস্বাদন করিব।

কজরারী অাঁখিয়ন মে, বস্যৌ রহত দিন-রাত। প্রীতম প্যারো হে সখী তাতে সাঁওর গাত।।

জয় শ্রী রাধে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও সাধনতত্ত্ব

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস, বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রায়ঃ দেখা যায় মানুষ কামনা-বাসনার দাস, মায়ার দাস। কারণ মানুষের প্রয়োজন ফুরায় না। সদা-সর্ব্বদাই কিছু না কিছু চাওয়া-পাওয়া লেগে থাকে। এই চাওয়া-পাওয়া শেষ হয় না, কারণ জীবের অপূর্ণতা। অপূর্ণ জীব পূর্ণ হইতে চায়। অতৃপ্ত জীব তৃপ্তি খোঁজে। মরণশীল জীব অমৃতের দিকে ছোটে। যত সময় না তার অমৃতময় ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে ততক্ষন পর্য্যন্ত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি নাই।

বর্ত্তমানে যে জীবনের প্রয়োজনগুলি তাহা আমরা খুব বুঝি, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের প্রয়োজনটা বুঝি না বা ভাবি না। কাজ করিবেন পেটের জন্য, পেটের কি প্রয়োজন, জীবন-ধারণের জন্য ইহা স্পষ্ট। কিন্তু জীবন ধারণ কিসের জন্য সেটা আমরা বুঝি না বা জানি না।

জীবনে আমরা সময়ের দিকে খেয়াল রাখি কিন্তু এ হিসাব দশ-বিশ মিনিটের। সারা জীবনের যে হিসাব তাহা আমরা রাখি না, ভাবি না। এই সমগ্র জীবনের প্রয়োজনটার নামই বৈষ্ণবশাস্ত্রে- প্রয়োজন তত্ত্ব। জীবনের যেটি চরম প্রয়োজনীয় বস্তু সেটি কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপাদকে এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন-

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।"

যে প্রয়োজন মিটিলে সকল প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটে তাহা হইল *"প্রেম।" "প্রেম প্রয়োজন।"* সাধ্যতত্ত্ব বলা হইতেছে *"প্রেম।"* লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন, এমন কথা বলা হয় নাই। কেন না খাদ্য আছে ক্ষুধা নাই, ভোগ হইবে না সুতরাং আগে প্রয়োজন ক্ষুধার। কৃষ্ণ আস্বাদনের ক্ষুধাই প্রেম। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব প্রেমের এক অনির্ব্বচনীয় স্বভাব। প্রেমরূপ ক্ষুধা হৃদয়ে জাগিলে আস্বাদ্য বস্তু প্রেমের বিগ্রহ সেখানে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য।

প্রীতম ছবি নৈনন বসী, পর ছবি কহা সমায়। ভরী সরায় রহীম লখি, আপ পথিক ফিরি জায়।।

আর এই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাইবার উপায়ের নাম *"সাধন।"* প্রেমধন প্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি। *"ভক্তি প্রাপ্তির সাধন।"* ভক্তি বস্তু বড় দুর্লভ। শ্রীরূপের শিক্ষায় মহাপ্রভু ভক্তির সুদুর্লভতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অগণিত জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণশীল। জলচর, স্থলচর, গগণচর অসংখ্যেয় জীবজন্তুর মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। তার ভিতরে শাশ্বত বৈদিক সিদ্ধান্তের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে এরূপ মানবের সংখ্যা আরও অল্পতর। যারা বেদ মানে তার মধ্যে অর্দ্ধেক লোক আবার বেদ মানে মাত্র মুখে। জীবনের আচরণে বৈদিক সত্যের প্রকাশ নাই।

বৈদিক ধারা অনুযায়ী যাহাদের জীবনের আচরণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যাগযজ্ঞ-ক্রিয়া-কর্ম্মান্বিত। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয় নাই। আবার ওই তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে সকলে অনুভূতি সম্পন্ন নহে। তত্ত্বের অনুভূতি ছাড়া মুক্তি হয় না। জ্ঞানসম্পন্ন কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন অনুভূতি লাভ করতঃ মুক্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ কোটি মুক্ত মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ, পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে।

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ, বন্ধন হইতে অব্যাহতি হইল মুক্তি। মুক্তি কথাটা অভাববাচী, ভক্তি কথাটা ভাববাচী। অসতের বন্ধন বা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি, কিন্তু সতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম ভক্তি। সম্পূর্ণ বিয়োগের নাম মুক্তি আর ভক্তি হচ্ছে একমাত্র সতের সঙ্গে যোগ প্রাপ্ত হওয়া। তাই মুক্তির সাধনা এক আর ভক্তির সাধনা অন্য। দৃষ্টি ভিন্ন, দৃশ্যও ভিন্ন।

"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

কারণ মুক্তি সুখের মধ্যে একটা আপাতপূর্ণ তৃপ্তির আভাস আছে। উহাতে যিনি মুগ্ধ হন তাঁহার ভক্তি সাধনার পথই রূদ্ধ হইয়া থাকে।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা হৈনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধিশুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সাধনতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। সাধ্যতত্ত্ব বলা হইতেছে প্রেম। আর প্রেম প্রাপ্তির উপায়ই হইতেছে- সাধন। সাধন কি? ভক্তি। ভক্তির দুর্লভতার প্রসঙ্গ চলিতেছে। মুক্তিকামও কামী, একমাত্র ভক্তই নিষ্কাম আর এজন্য ভক্ত শান্ত। শান্ত বলিয়াই ভক্তির অধিকারী অর্থাৎ শান্ত রসের পরই ভক্তিরস আরম্ভ হয়। ভক্তির প্রারম্ভে চাই শান্তি।

ভক্তির দুর্লভতার কথা বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীরূপকে কহিয়াছেন ভক্তি প্রাপ্তির কথা। বলেছেন সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে-করিতে ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবান জীব ভক্তিলতা বীজ লাভ করে। কে সেই ভাগ্যবান?

সংসার পথে চলিতে-চলিতে কদাচিৎ কাহারও মনে যদি শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহলে সে ভাবিবে যে আমার অপর্যাপ্ত ধন জন বিদ্যাবুদ্ধি সামর্থ্য সৌন্দর্য্য থাকিলেও আমি নিতান্ত হতভাগ্য- কারণ এখনও আমার হরিভক্তি হইল না। এই ভাবনা তীব্র হইয়া যদি চিত্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়।

ঐরূপ ভাবনাও যে বিনা কারণে উদয় হয় তাহা নহে। এর মূলে হচ্ছে সাধুসঙ্গ। যদি কোনও ভক্তিধনে ধনী যাহারা, তাহাদের সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ হয় তবে ঐ ধনের অভাব হেতু বেদনার উদয় হয়। কিন্তু অভক্তের সঙ্গ-সান্নিধ্যে হৃদয়ে ভক্তি থাকিলেও তাহা শুকাইয়া যায়। তাই একথাটা অতিশয়োক্তি নহে-

"লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

ভক্তিমান সজ্জনের অর্থাৎ সাধুসঙ্গবশতঃ যাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগিয়াছে সে-ই ভাগ্যবান। আর এইরূপ ভাগ্যবান জন *"গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।"* *"প্রসাদে পায়"* শ্রীমুখের এই কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভক্তিবীজ চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র কৃপাতেই পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বতোভাবেই প্রসাদলভ্য। কদাপি প্রয়াসসাধ্য নহে। তবে কি প্রয়াসের কোন সার্থকতা নাই। আছে অবশ্যই। না থাকিলে এত সাধন ভজন জপতপ করিতে বলা হইবে কেন?

বহু কষ্টকর প্রয়াস বা ভজন সাধনের ফলে জানা যাইবে যে তিনি প্রচেষ্টালভ্য বস্তুই নহেন। চেষ্টা আপন ব্যর্থতা জানাইয়া দিয়া- অন্তরে অনুভব করাইয়া দিয়াই সার্থক হয়। প্রকৃত অনুভূতি লাভ কৃপাতেই হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রেও আছে- *"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"* যাহাকে কৃপা করিয়া বরণ করিয়াছেন সে-ই তাঁহার সন্ধান জানে। অন্য সকলের অন্য সকল প্রকার আয়োজনই আড়ম্বর মাত্র। অনুগ্রহ-শক্তির মূর্তি **শ্রীগুরুকৃপা** ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই।

এখন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনের কথা বলা হইতেছে। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে যখন কাহারও হৃদয়ে ভক্তিলতা বীজ-বপন ফলে তার অঙ্কুরণ শুরু হয় তখন নিত্যপ্রতি জলসেক দ্বারা তাহার বর্দ্ধন সাধন করিতে হইবে। এই ভক্তিলতা বাড়িতে-বাড়িতে যখন ব্রহ্মলোক পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পতরুতে আরোহণ করিবে তখন ঐ লতায় প্রেমফল ফলিবে। জলসেক কিন্তু চলিতেই থাকিবে, যেমন বীজের গায়ে তেমনিই ফলবতী লতার গায়ে। ভক্তিলতার জলসেক হইল- **শ্রবণ-কীর্ত্তন**। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

এই ভাগবতীয় সাধন- **শ্রবণ-কীর্ত্তন**, মহাপ্রভুর দান। অন্য সকল প্রকার সাধন অপেক্ষা এই ভাগবতীয় সাধনে এক অপূর্ব্বতা আছে। অন্যান্য সকল প্রকার সাধনে প্রথমে শাস্ত্রোক্ত সাধন-রহস্য আচার্য্যমুখ হইতে শ্রবণীয়, তৎপর জীবনের আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিপালনীয়। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভাগবতীয় সাধনায় মাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ফলপ্রাপ্তি। প্রেমপ্রাপ্তি রূপ ফল লাভ হয় ইহা এক অভিনব কথা। মাত্র কথা শ্রবণেই মঙ্গল হইবে কিরূপে? ইহা একমাত্র ভাগবৎ শাস্ত্রেতেই রহিয়াছে। ভাগবতের লক্ষ্য হইল পুরাণপুরুষের নিত্যনবায়মান লীলাকথার বর্ণনা করা। যে শাশ্বতসত্য ব্রজবনে প্রকটিত হইয়াছে তাহার সংবাদ ঘোষণা করা। ঐ ঘোষণা কর্ণগত হইলেই কল্যাণের উৎস খুলিয়া যায়। ইহাই ভাগবতশাস্ত্রের দাবী। এই রহস্যটি স্পষ্ট করা হইতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের সঙ্গে সম্বন্ধটি অনাদি ও নিত্য, সম্বন্ধটী কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কেবলমাত্র বিস্মৃতির আবরণে আবৃত থাকে।

তাই ভাগবতের নিত্য লীলাকথা যতই শোনা যায় ততই বিস্মৃতির আবরণ কাটে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের চির আপন-জন। ব্রজের রসতত্ত্বেই জীবের নিত্য বসতি। এই নিত্য সম্বন্ধ তাহার মনে নাই। সম্বন্ধের শাশ্বত সূর্য্যকে বিস্মৃতিরূপ মেঘ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। *"মার্জ্জন হয় ভজন।"* ভজন দ্বারাই ঐ মেঘের অপসারণ। নিত্য ব্রজকথা শ্রবণরূপ পবন প্রবাহেই হইবে আবরণকারী মেঘের অপসৃতি। ব্রজের রাসলীলার কথা শুনিতে-শুনিতেই প্রাণ, প্রাণদয়িতের জন্য আকুল হইয়া উঠিবে। রাসলীলার উপসংহারে শ্রীশুক এই কথাটি বলিয়াছেন-

"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।"

নিত্য নবায়মান মধুরিম ব্রজকথার পুনঃ-পুনঃ শ্রবণ অনুশীলন হইল, মাধুর্য্যঘন ব্রজ-প্রাপ্তির উপায়। কর্ণে আমাদের মল আছে, তাই শুনিলেও শোনা হয় না। কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। সেইজন্য- *"নিত্যং ভাগবত্ শৃণু।"*

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিতেছেন-

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত রে
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভাব সুনির্ম্মল রে।"

-সংকীর্তন পদামৃত (পদ-১৩৬)

নিত্য শোন, নিয়ত শোন অভিনিবিষ্ট চিত্তে অখণ্ড মনঃ-সংযোগে শোন। শ্রবণ-কীর্তনই চরম কল্যাণবহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অমৃত, তাঁর কথাও অমৃত। সে অমৃতকথা যিনি কীর্ত্তন করেন তিনি পূর্ণামৃত আস্বাদন করেন আর যিনি শ্রবণ করেন তাঁহারও পরমামৃত আস্বাদন হইয়া থাকে।

এই শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেকে ভক্তিলতা বাড়ে। শ্রী নারদভক্তিসুত্রে ভক্তিকে অমৃতস্বরূপা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান বলিতেছেন- *"ভক্ত্যামামভিজানাতি"*- ভক্তিদ্বারা আমাকে সম্যক রূপে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন *"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"*, *"ভক্তিরেবভূয়সী"* শ্রীভগবান ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। *"ভক্তিরেব*

বিষ্ণুপ্রিয়া।”

মানবের প্রতি, ভক্তের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি, দৃষ্টি ও আচরণ যাঁহার যত নির্ম্মল, তাঁহার সাধনা তত শক্তিশালী। তাই ভক্তিলতার বর্দ্ধনের পথে বাধা আছে দুইটী, একটী বৈষ্ণবাপরাধ, অপরটী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সাধ। আরাধ্যবস্তুর প্রতি লক্ষটি সুস্থির থাকিলেই বাধারূপী ঐ বিপদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। **শরীর** ও **সংসারকে** সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াই ভক্তিলতামূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়। এইরূপ বুদ্ধিতে স্থির হইয়া ব্রজকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে।

সৎ অর্থাৎ যুগলচরণের আশ্রয় ও **অসৎ অর্থাৎ শরীর ও সংসারকে** বিসর্জন দিয়া **সাধন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ** জলসেকে ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে পৌঁছিবে। তখন ব্রজবন হৃদয়বন একাকার হইয়া যাইবে, কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা অন্তরে অনুভূত হইবে ও ভক্তিলতায় পরম পুরুষার্থ প্রেমফল ফলিবে।

ভাগবতীয় এই সাধনতত্ত্ব মহাপ্রভু জগৎকে দান করিয়াছেন আর এই অভিনব দানকে আরও সমৃদ্ধ এবং বিস্তার করিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। শ্রবণ-কীর্ত্তনের স্বরূপকে সম্প্রসারিত করিয়াছেন কেমন করিয়া তাহাই বলিব।

আমরা জানি সংকীর্ত্তনের পিতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। পাঁচশত বছর আগে মহাপ্রভুর কৃপায় দিগ্‌দিগন্ত কীর্ত্তনের রোলে পরিব্যাপ্ত ছিল। তবে বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে বিশেষভাবে কৃপাপ্লাত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ধীরে-ধীরে স্তিমিত হতে-হতে একশত বছর আগে প্রায়ঃ অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের প্রান্তে কতিপয় মহাপুরুষ এই কীর্ত্তনানন্দকে উজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভু জদ্বন্ধুসুন্দরের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। জনে-জনে গ্রামে-প্রান্তরে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কীর্ত্তন প্রচারণ বিশেষ করে স্বরচিত পদের গানে, কীর্ত্তনে মানুষের প্রাণ ঝঙ্কৃত হইয়াছিল।

কামধেনু কলপত রহী, হোঁ ন ভই ব্রজ গায়। রাধা দেতী দোহনী, মোহন দুহতো আয়।।

বর্ত্তমানে মহামন্ত্র যে হরেকৃষ্ণ নাম পৃথিবীর সর্বত্র কীর্ত্তন হচ্ছে এর মূলে রয়েছেন শ্রীশ্রীপ্রভু (শ্রীগৌরসুন্দর), কিন্তু বিশেষ অবদান শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের। কেন না শ্রীশ্রীগুরুদেব বলতেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু মহামন্ত্র সর্ব-সমক্ষে উপনীত করেছেন ঠিকই কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে ও পশ্চাতেও এর কীর্ত্তনীয় স্বরূপ পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহামন্ত্র জপের কথা উল্লেখ আছে। মহামন্ত্রের কীর্ত্তনীয় স্বরূপটী দিয়েছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। প্রভু বলতেন এই মহামন্ত্ররূপ নামকীর্ত্তন এত উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করিবে যেন সহস্রহাত দূর হইতে কীর্ত্তনের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করতে পারে। এ বিষয়ে ***“শ্রীশ্রীবন্ধুপদ পরিচিতি”*** লেখক শ্রীযুক্ত হরিহর বন্ধোপাধ্যায় লিখেছেন (সংকীর্ত্তন পদামৃতে পৃষ্ঠা-১৯)-

অন্য দিকে কয়েকটী ছোট পদে প্রভুবন্ধু বড় একটী ভাবী সমস্যার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন—পদ সংখ্যা- ১৩৩

“গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষ্ণ নাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল অবিরাম।।”

এই পদ রচনার পঞ্চাশ বছর পরে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও কলিকাতার পণ্ডিত সমাজে প্রশ্ন উঠে- তারকব্রহ্ম নাম কি শুধু জপনীয় কিংবা জপনীয় ও উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তনীয় দুইই। ইহা লইয়া বহু বাকবিতণ্ডা হইয়াছে এবং উহা আজও অমীমাংসিত রহিযাছে। প্রভুবন্ধু বহুদিন পূর্বেই স্পষ্টাক্ষরে ঐ নাম গান করিতে বলিয়াছেন। আজ প্রভুরই ইচ্ছা শক্তিতে এই শতকের প্রথম ভাগে অন্ততঃ দশটী স্থানে অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছেন- সর্ব্বত্রই ***“হরে কৃষ্ণ নাম ”*** গীত হইতেছেন।

“উন্নত উজ্জ্বল রস ” বস্তুটী হইল পরম সাধ্য বস্তু। ভক্তি হইল তৎপ্রাপ্তির সাধন এক লতারূপ। এই ভক্তিলতা বৃদ্ধি পায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ জলসেকের দ্বারা। আর এই শ্রবণ-কীর্ত্তনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, যাহা মহাপ্রভুর দান তাই তিনি সংকীর্ত্তন পিতা। প্রভু (গৌরহরি) বলছেন-

তীন লোক, চৌদহ ভুবন, ভোজন পুজবত জোয়। দ্বারে দেখোঁ নন্দ কে পুত মাঁগত মাখন রোয় ।।

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম পায়।।

শ্রবণ-কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবন্নাম, গুণ, লীলা, রূপ ও ধামের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন। নামজপ, নামকীর্ত্তনই ইহার ভিতরে প্রধান। নামের দ্বারাই বাকী সব পরিপূর্ণতা লাভ করে। নাম ও নামী এক।

নাম ভজনই সার। নাম ভজনের সঙ্গে নামীর রূপ, গুণ, লীলারও অফুরন্ত আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। নামাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ। তাই নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

আর এই সংকীর্ত্তনকে বিশেষ করে নাম-সংকীর্ত্তনকে বিশেষ ভাবে বিস্তারিত রূপ দিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জদ্বন্ধুসুন্দর সেটা আমরা দেখিলাম। এখন মহাপ্রভুর হার্দ্দ সাধ্যতত্ত্বটি যে ব্রজের সেবাকুঞ্জের উন্নত উজ্জল রস তাহা আলোচিত হইবে। বৈষ্ণবকৃপাহি কেবলম।

বাল কৃষ্ণ মাখন লিয়ে, করত তোতরী বাত। হৌলে-হৌলে ঘুটরুন চলত, দেখত নৈন সিরাত।।

জয় শ্রী রাধে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও সাধ্যতত্ত্ব

আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সাধ্যবস্তুর দিকে ছুটিয়াছি। কারণ সাধ্যতত্ত্বে পৌঁছিতে না পারা পর্য্যন্ত জীব আপন স্বরূপ বা স্বভাবে স্থিত হইতে পারে না। বরফ যেমন জল হইতে না পারা পর্যন্ত গলিতে থাকে, জীবও সেই-রূপ সাধ্যতত্ত্ব না পাওয়া পর্য্যন্ত গতিশীলই থাকে। শান্ত হয় না।

সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে।
তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নুমঃ।।

-শ্রীমদ্‌ভাগবত্‌

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার তিনি। কিন্তু আমাদের কি স্বরূপ-

"মমৈবাংশো জীবলোকে"

-শ্রীশ্রীগীতা

কিংবা- *"ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী।*
চেতন অমল সহজ সুখরাশি।। "

-শ্রীরামচরিত মানস

"মমৈবাংশো " বা ***"ঈশ্বর অংশ "*** স্বরূপ জীবও সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু এক বিন্দুর ন্যায় আর ভগবান অগাধসিন্ধু, তাই জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক প্রত্যেকটা জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দের দিকেই গতিশীল।

সাধ্যতত্ত্বের লৌকিক অর্থ যাহা, তাহা কিন্তু পারিভাষিক অর্থ নয়। আবার বৈষ্ণব আচার্য্যদের সাধ্য শব্দের প্রয়োগ আরও গভীর অর্থে। কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা সাধনীয় বস্তুই সাধ্য নহে বরঞ্চ সমগ্র জীবনের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার দ্বারা সাধন করিতে হইবে যে বস্তু বা ভাবকে তাহাই সাধ্য। অখণ্ড এই জীবনটা যে মহান উদ্দেশ্যে ভুবনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ও পুনঃ-পুনঃ গতায়াত করিতেছে, সেইটী হল সাধ্যবস্তু।

জাকে মনমে বস রহী, মোহন কী মুস্কান। নারায়ণ তাকে হিয়ে ঔর ন লাগত জ্ঞান।।

যে উপায়ে সাধককে সাধ্যের দিকে দ্রুততর লইয়া যাওয়া যায় তাহাই সাধন। ভক্তিই সাধ্যপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন আর **শ্রবণ-কীর্ত্তনই** এই সাধনের প্রধান অঙ্গ একথা অর্থাৎ সাধনতত্ত্বের দিকদর্শন হইয়াছে, এই বারে সাধ্যতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে।

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন-ভিন্ন অনুভব আছে। আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় মহাপ্রভুর হৃদয়স্থিত অনুভব। উহা শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের নানা স্থানে ছড়ান রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খল ভাবে উহা সজ্জিত আছে ঐ গ্রন্থের মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ সংবাদে।

"প্রভু কহে - পড়শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"

"পড়শ্লোক" বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও জানিতে চাহিলেন। শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে নিজ অনুভবকে মিলাইয়া বলিতে হইবে। কেন না বিদ্বদানুভূতি ও আপ্তবাক্য ইহার উপায়, আর প্রমাণ নাই। যেমন জিজ্ঞাসার কৌশল তেমনিই উত্তরের চাতুর্য্য। রায় মহাশয়ের উত্তরে বিকাশের ক্রমেতে শাস্ত্রে যে বিভিন্ন সাধ্যতত্ত্বের নির্দেশ আছে তাহা ধীরে -ধীরে আত্মবিকাশ করিয়াছে।

রায় কহে- ***"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।"*** (১)

প্রথমে রামরায় ***"স্বধর্ম্ম আচরণকে "*** সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। চারিবর্ণ ও চারিআশ্রম নিয়ন্ত্রিত সমাজে যিনি যে ভূমিতে আছেন যদি সেই ভুমির নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করেন তাহা হইলে সমাজ শৃঙ্খলাও অক্ষুণ্ন থাকে। সমাজের দ্বারা মানুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্যও সফল হয়। ভগবানও প্রীত হন।

প্রভু ***"ইহ বাহ্য"*** বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং ***"আগে কহ আর"*** বলিয়া মহত্তর সাধ্যের কথা শুনিতে চাহিলেন।

প্রভুর অন্তর বুঝিয়া রামরায় কহিলেন-

"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।" (২)

কর্ম্ম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেই প্রকৃত কর্ম্ম করা হয়। যে কর্ম্মের ফলার্পণ ভগবচ্চরণে হয় নাই, আত্মসুখেই নিয়োজিত হইয়াছে সে কর্ম্ম ব্যর্থ, কুকর্ম্মের তুল্য। কর্ম্মের বিচার কর্ম্মীর অন্তরের প্রেরণায়। ঐ প্রেরণায় যদি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি থাকে তাহা হইলেই কর্ম্ম যোগ পদবাচ্য ও মহান হইয়া থাকে।

প্রভু কহিলেন ***"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"*** অন্তর বুঝিয়া রাম রায় কহিলেন- ***"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার।"*** (৩)

কর্ম্ম করিয়া ফলার্পণ নহে কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ। প্রথমে ফলদানের কথা ছিল, এখানে আত্মদানের কথা হইতেছে। নিজেকে যে দিয়াছে তার আর স্বধর্ম্ম কি? স্ব থাকিলে তো স্বধর্ম্ম। সেই সর্ব্বেশ্বরে স্ব-সমর্পণের ফলে স্বধর্ম্ম আর নাই। আত্ম না থাকায় আত্মকর্ম্মও নাই। এই কর্ম্মহীনের কর্ম্মই নিরবদ্য। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে ক্রীড়ণক হইয়া সে কর্ম্ম করে। পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দুয়ের অতীত হইয়া তাহার কর্ম্ম বিরাজমান থাকে। কর্ম্ম যেখানে মরিয়া গেল, সেইখানেই সে বাঁচিয়া রহিল।

সমর্পণের এই সাধ্য ভূমিতে দাঁড়াইয়াও মহাপ্রভু ***"এহ বাহ্য আগে কহ আর"*** ঘোষণা করিলেন। ব্রজে যাদের সর্ব্ব সমর্পণ হইয়াছিল তাঁহাদের পাপ-পুণ্যের ভাবনা তো ছিলই না এমনকি মুক্তি বা মোক্ষের আশাও ছিল না। সেটি হইয়াছিল যে পরাভক্তির বলে, প্রভু রাম রায়কে সেই দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

রাম রায় বলিলেন-

"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।" (৪)

একমাত্র শরণ্য তিনি, এই জ্ঞান হইলেই শরণাগতি জাগিবে। একমাত্র ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অন্য কোন উপদেশ বা ভরসা বাণী নহে। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভূমিতে আরোহণ করিলেই ভক্তির উদয়ে চিত্ত তখন চির প্রসন্ন সদা আনন্দময়। জ্ঞানের

উদয়ে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সর্ব্বাত্মময়। এই আত্মময়, আনন্দময়, ব্রহ্মময় অবস্থাই সাধ্যসার।

গীতার উন্নততম সাধ্য পীঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুগম্ভীর কণ্ঠে প্রভু গৌরহরি বলিলেন- *"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"*

রায় কহে-

"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।" (৫)

"তিনি ভগবান", একথা জানিয়াই ভক্তি করিতে হইবে। একথা সত্য, কিন্তু এই বুদ্ধিটি ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহা গাঢ়তম নহে। যে ভক্তির মধ্যে ভগবত্তানুসন্ধান প্রবেশ করাইবার বিন্দুমাত্র স্থান নাই তাহাই গাঢ়তম ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি আর এ দিকেই প্রভুর দৃষ্টি।

ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া নিবে। জ্ঞান ভূমিকাতেই ভক্তির স্থিতি হইবে। আবার জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি শুদ্ধ হইবে না। তাহলে উপায়, সমাধান এই যে জ্ঞান হইতেই ভক্তি দেখা দিবে কিন্তু জ্ঞানশূন্যা হইয়াই আপনাকে স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবে। জ্ঞানশূন্যা হইবে জ্ঞানকে সরাইয়া দিয়া নহে। নিবিড়তর ভাবে জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়াই ভক্তি জ্ঞানশূন্যা হইবে।

কর্ম্মার্পণে কর্ম্ম পূর্ণতায় পৌছিয়া বিদায় লইয়াছে। তারপর জ্ঞান আসিয়াছে। এখন জ্ঞানও পূর্ণতায় পৌঁছিয়া বিদায় লইতেছে। জ্ঞান কর্ম্মের আবরণ শূন্যা ভক্তিই উত্তমা ভক্তি। জ্ঞান-কর্ম্মের নদী শুদ্ধাভক্তি সাগরে আসিয়া একাকার হইয়া যায়। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে বাস করিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার বার্ত্তা শ্রবণ মনন উচ্চারণ করতঃ তোমার (প্রভুর) মধুরিমা আস্বাদনেই জীবন ধারণ করে, সর্ব্বত্র অজিত হইলেও ভগবান এতাদৃশ ভক্তের কাছে পরাজিত। ভক্তির দ্বারে ভগবান পরাজিত হন। কখন হন? যখন ভক্ত ভগবত্তা জ্ঞানশূন্যা হইয়া একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে নিমগ্ন হন তখনই তিনি ভক্তের অধীনতা স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞানশূন্য ভক্তিতেই

অজিত *"জিত"* হইয়া থাকেন।

প্রভু কহিলেন *"এহো হয়"* জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই যে উত্তমা ভক্তি এবং তাহাই যে সাধ্য, প্রভু আপন সম্মতি জানাইলেন, কিন্তু *"আগে কহ আর"* বলিয়া আরও নিগূঢ়তর সাধ্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

"প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার।" (৬)

উত্তর করিলেন রামরায়। প্রেমভক্তি ও জ্ঞানশূন্যা ভক্তি কথা প্রায় একই তবে কিছুটা তফাৎ আছে। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞানাভাস আছে। প্রেমভক্তির ভূমিকায় তাহাও নাই। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত ভক্তিদেবীর বাহিরের দিকটা প্রকাশিত হয় কিন্তু অন্তরের দিকটা প্রকটিত হয় প্রেমভক্তিতে। জ্ঞানশূন্যায় ভক্তির ফুটন্ত ফুল দেখি। প্রেমভক্তিতে ভোগ করি ফুটন্ত ফুলের অন্তরের মনমাতানো সৌরভটী আর তাহা হইলে কৃষ্ণতৃষ্ণা প্রেমভক্তির ভূমিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে- শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিবার জন্য দারুণ ক্ষুধা। প্রেমভক্তি সাধ্যভূমির আরও একটি বিশেষতা যে- ***প্রেমভক্তি কোন প্রকার প্রয়াসসাধ্য সামগ্রী নহে। উহা একান্তভাবেই প্রসাদ লভ্য। কৃপা-করুণাই একমাত্র সম্বল।***

শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম মাধুর্য্য অন্তরে লোভসৃষ্টি করে। তাই কৃপা-করুণার প্রকাশ হয় অন্তরে লোভ রূপে। কি ভাবে? যখন কোন ভক্ত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করে, মন-প্রাণ তাঁহার কৃষ্ণভক্তি রসে ভাবিত হইয়া পড়ে, আনন্দ হিল্লোলে হৃদয় দুলিতে থাকে, তখন তদ্দর্শনে বা মননে হৃদয়ে লালসা জাগিয়া উঠে। ঐ লোভই প্রেমভক্তির কারণ। লোলুপতাই ঐ বস্তুর (প্রেম) একমাত্র দাম। ইহা ছাড়া কোটী জন্মার্জ্জিত কোন প্রকার আর সুকৃতিই নাই।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মুল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"

কৃষ্ণতৃষ্ণাময় প্রেমভক্তিই জীবের পরম সাধ্য- সংশয় নাই তথাপি নিগূঢ়তর রহস্য আস্বাদন মানসে প্রভু কহিলেন-

"এহো হয় আগে কহ আর।"

রসবেত্তা রায় রামানন্দ অন্তরের ভাব বুঝিয়া উত্তর করিলেন-

"দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।" (৭)

প্রেমভক্তিতে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হলে রসতা প্রাপ্ত হয়। প্রেমভক্তি সরসীর মত, স্রোত নাই। বিশিষ্ট কোন সম্বন্ধের অনুভূতি জাগিলেই সরোবরে প্রবাহ খেলে, স্রোত বহিয়া চলে। দাস প্রভু সম্বন্ধেই প্রেমভক্তির বিশিষ্টরূপ, অশেষ বিচিত্রতা আত্মপ্রকাশ করে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম পরম আকাঙ্ক্ষাণীয় বস্তু কেননা জীব মাত্রেরই স্বরূপ হইল নিত্য কৃষ্ণদাস। ইহা পাইলে আর কিছু বাকী থাকে না। প্রভুও তাই *"এহো হয়"* বলিয়া সমর্থন করিলেন কিন্তু *"আগে কহ আর"* বলিয়া গূঢ়তর রহস্যের আস্বাদন লালসে তৃষ্ণাতুরের মত রামরায়ের বদন পানে চাহিলেন।

রায় মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিয়া কহিলেন-

"সখ্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।" (৮)

কৃষ্ণকে ভালবাসাই জীবের চরম সাধ্য নহে। ভালবাসিয়া তাঁহার সেবা করা, সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করা ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। *"কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান"* - প্রভু ও দাসের মধ্যে ব্যবধান বেশ বৃহৎ। শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানে এই দাস্যোচিৎ বাধা- সখ্যরসে নাই। দাস্যের ব্যবধানবোধ, বড়ত্বের জন্য সঙ্কোচ সখ্যপ্রেমে ঘুচিয়া যায়। সখ্যরসের এমনই সামর্থ্য- যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখাদের একটা অভিন্নতাবোধ জাগাইয়া দেয়। এই অভিন্নমননই সখ্যপ্রেমের প্রাণস্বরূপ।

শ্রীশ্রীপ্রভু পরম উল্লাসভরে বলিলেন *"রায় এহোত্তম"* ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য কিন্তু উত্তমত্ব স্বীকার করিয়াও তারও নিবিড়তর আস্বাদনলালসা

ব্যক্ত করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন- *"রায় আগে কহ আর।"*

মর্ম্মীভক্ত প্রভুর অন্তর বুঝিয়া কহিলেন-

"বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।।" (৯)

উত্তমের পর আর কি আছে, তাহা ভাবনা করা অসম্ভব হইত যদি প্রভু স্বয়ং সুযোগ করিয়া না দিতেন। নতুবা এই সকল কথা এতই গূঢ় যে-

"বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।"

বাৎসল্য রসের আস্বাদন মাধুর্যে কেবল যে ভক্তই আত্মহারা তাহা নহে, ভগবানও ভক্তের মাধুর্যসাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। এই আত্মহারা অবস্থাটি ভক্ত ভগবানে সমভাবে চরমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাৎসল্য রসের মহাবিষ্টতায় ভগবান আপন ভগবত্ত্ব-হারা হইয়া বালকরূপে লীলাস্বাদন করেন। ভগবানের আপনহারা ভাবটী পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়- বাৎসল্য রসের উদ্বেলিত সাগরে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের শ্রীমদ্‌ভাগবতে মৃত্তিকা ভক্ষণ ও দামবন্ধনলীলা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাৎসল্য রসের মধুরিমা শ্রবণে পরমানন্দে মধুসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। রায়- *"এহোত্তম"* কহিলেন উৎফুল্ল বদনে। সেই প্রেমই সাধ্যসার যে প্রেমে মুক্তিদাতা বন্ধন গ্রহণ করেন। কিন্তু আরও গূঢ়তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার বাসনায় কহিলেন, *"আগে কহ আর।"*

রাম রায় কহিলেন- *"কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।"* (১০)

প্রভুর মধুর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অন্তরের লালসাটি ইঙ্গিতে বুঝিয়াই কহিলেন। উদাহরণস্বরূপ প্রস্তুত করিলেন শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ বর্ণনাস্বরূপ যে শ্লোক শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, ব্রজাঙ্গনাগণের যে জাতীয় আস্বাদন রাসোৎসবে প্রকট হইয়াছিল তাহা ভাষার অতীত। অন্য কাহারো পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবেই অলভ্য। ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণ আমারই, এই অনুভব প্রীতিকে পরম শক্তিশালী করে।

গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করেন না বরং শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের অপেক্ষা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ধব *"অস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ"* কথাটা বলিয়াছেন। কথাটীর তাৎপর্য্য এই যে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণই ব্রজাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের প্রবল স্রোতের বেগে ভাসিয়া না যান এজন্যই যেন তাঁহাদের কণ্ঠদেশকে অবলম্বন করিয়া রাসরসে হাবডুবু খাইতেছেন।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।

যদিও সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম তিনই উত্তম তথাপি কান্তারতি সাধ্যের অবধি, কারণ- *"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।"* কান্তারতিতে প্রত্যেক রসের সবকটী গুণ তো আছেই অধিকন্তু আছে নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা যাহা অন্য রসে প্রকট হইতে পারে না। যেমন শান্তরসের দুইটী গুণ। (১) কৃষ্ণনিষ্ঠা ও (২) কৃষ্ণভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ। দাস্যরসে এদুটী গুণতো আছেই উপরন্তু আছে (৩) সেবানিষ্ঠা, যাহা শান্ত ভক্তে নাই। সখ্যরসে দাস্যরসের তিনটি গুণ তো আছেই অধিকন্তু আছে, (৪) অসঙ্কোচে অভিন্ন-মননে সেবা, যাহা দাস্যে সম্ভব নয়। বাৎসল্যরসে সখ্যরসের চারিটী গুণ তো আছেই, উপরন্তু আছে (৫) মমতাধিক্যে **তাড়ন-ভর্ৎসন**, যাহা সখ্যরসে পাওয়া যায় না। এই হেতুই কান্তাপ্রেম সাধ্যের অবধি।

সমগ্র জীবনের চরমতম পরম লক্ষ্যটীই হচ্ছে সাধ্যতত্ত্ব- মহাপ্রভু তাহারই নির্ণয় শুনিতে চাহিয়াছেন একথা সাধ্য শব্দের অর্থ বিচারে প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহা বলা হইল।

(১) স্বধর্ম্মপালন (২) কর্ম্মার্পণ (৩) ধর্ম্মার্পণ ও (৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এই চারিটী কক্ষাকে বলিয়াছেন- *"বাহ্য।"*

(১) জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি (২) প্রেমভক্তি ও (৩) দাস্যপ্রেম, এই তিনকে বলিয়াছেন *"হয়।"* ৪+৩=৭- (৮) সখ্যপ্রেম ও (৯) বাৎসল্য

প্রেমকে বলিয়াছেন *"উত্তম।"* আর (১০) কান্তাপ্রেমকে বলিয়াছেন *"অবধি।"*

চার, তিন, দুই ও এক এই দশটী ভূমি। ক্রমে-ক্রমে উর্দ্ধভাবে যেন দোলমঞ্চের মত সাজান। ভিত্তিতে চারটি শিখরে এক-একটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমির পর-পর ভূমিকায় সার্থকতা। পূর্ব্ববর্ত্তী নয়টি স্তরের যাহা শাশ্বত মাধুর্য্য, তাহা দশম বা শিখর ভূমিস্থিত *"অবধি"* তে পরিণতি প্রাপ্ত। পরিপক্ক ফলে যেমন বৃক্ষের শিকড় কাণ্ড, শাখা-পত্রের সার্থকতা - সাধ্যাবধি কান্তাপ্রেমের সেইরূপ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞানভক্তি ও পরাভক্তির পরম চরিতার্থতা।

একমাত্র শুদ্ধ প্রেমভক্তি পথে শ্রীকৃষ্ণচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মোপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করে। সর্ব্বপ্রকার সাধন মার্গের পরম লক্ষ্য, এই আত্মোপলব্ধি। সুতরাং কান্তাপ্রেমে গোপীকান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সেবায় অখণ্ড আত্ম উৎসর্গেই সাধ্যের অবধি অভিব্যক্ত।

আমার **আমিত্ব** পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষ্ণে সমর্পণে, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণময় হইয়া যায়। তখন **"আমিই"** আর থাকে না, কৃষ্ণই থাকেন। আবার কৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য **আমি** তখন পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপে **আমার** সত্তার সম্পূর্ণ লোপ ও সম্পুর্ণ স্থিতি একই কালে সম্ভব হয়। এই আপাতবিরোধী দার্শনিক তত্ত্বই গৌর পার্ষদগণের দান-অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অন্তস্তলে নিহিত। কান্তাপ্রেমকে সাধ্যাবধি বলিয়া মহাপ্রভু আরও আগে শুনিতে চাহিলেন। কেন?

সাধ্যাবধি কথার পর আর কোন প্রশ্ন চলে ইহা শ্রীরাম রায়ের চিন্তার অতীত। সুনিশ্চিত *"অবধি"*র পর গৌরসুন্দর আর কি শুনিতে এত বিনয় করিতেছেন তিনি তাহা বুঝিতেছেন না। তাই স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন- প্রভু সাধ্যের যে অবধির কথা বলা হইয়াছে- তারপর আরও শুনিতে চায় এমন কোনও ব্যক্তি সংসারে আছে কোথাও শুনি নাই। আজ আপনার মধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীশ্রীগৌরহরির অন্তঃপ্রেরণাতেই অসম্ভব সম্ভব হইল। বলিতে পারিব না বলিয়াও বলিতে আরম্ভ

করিলেন।

রায় কহিলেন-

"ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।। "

সাধ্যের অবধি কান্তাভাব। *"অবধি"*র পর *"শিরোমণি"* বলিতেছেন। কারণ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণদয়িত জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মদান হইয়া থাকে। কান্তাভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার। স্বকীয়া কান্তা ও পরকীয়া কান্তা। আচার্য্যেরা বলেন, স্বকীয়া প্রীতিতে রস হয় কিন্তু রসের নির্য্যাস আস্বাদিত হয় না।

পুরুষোত্তমে পরপুরুষ বুদ্ধি। এই ভাবনাতেই রসের নির্য্যাস। ব্রজে ব্রজদেবীগণের পরকীয়া কান্তাভাব। সংসারবদ্ধ জীবেরও ঐ ভাব পরম অবলম্বনীয়। বন্ধ জীবের সংসার অভিমণ্যুতে আপন বুদ্ধি। যিনি প্রকৃত আপনজন সেই শ্রীগোবিন্দে পরবুদ্ধি। ব্রজবাসীগণের ঐ অবস্থা যোগমায়া প্রভাবে, জগদ্বাসী জীবের ঐ অবস্থা মহামায়ার প্রভাবে। বাহ্যিক রূপ একই। সুতরাং মহামায়ার বিষয়-ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া যোগমায়ার কৃষ্ণ-সম্ভোগের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গোপীদের আনুগত্য ও পরম আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গরসায়নম।। "

বেদান্ত পঞ্চদশীর এই শ্লোকটীর প্রমাণ দিয়া সনাতন গোস্বামীপাদকে শ্রীগৌরহরি ঐ রূপ ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন। মন থাকে যার প্রিয়পুরুষের দিকে সেই পর-পুরুষাসক্তা নারী যেমন সংসারের সকল কর্ত্তব্যগুলি করে, সেই প্রকার গৃহীভক্ত সংসারের সকল কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠু সমাধান করিবে কিন্তু মনপ্রাণ ফেলিয়া রাখিবে শ্রীগোবিন্দের চরণকমলে। ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

তবে ব্রজদেবীগণের ভাব, সাধ্যের অবধি হইলেও ক্রমপরিণত রস-প্রবাহের চরম অবধি তাঁহারা প্রাপ্ত হয় নাই, তাঁহাদের যিনি মূখ্যা সেই রাধারাণীতেই তাহা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলছেন-

"ব্রজদেবীগণে এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।। "

একমাত্র শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রীতিই পরম অবধিতে অধিরূঢ় হইয়া থাকে। ঘৃত যেমন দুগ্ধের চরম পরিণতি, সেই প্রকার মহাভাব প্রেমের চরম অভিব্যক্তি। প্রেমবর্দ্ধিত হইয়া গাঢ়তা, গাঢ়তমতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এই ছয় কক্ষা পার হইয়া মহাভাবভূমিতে স্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কান্তাভাবের মূল লতা হচ্ছে শ্রীরাধাই। সখীগণ তাঁহার পল্লবপুষ্পপাতা স্থানীয়া মাত্র। বস্তুতঃ কান্তাভাব সাধ্যসার কথাটিতে নির্দ্দেশটা সামান্যভাবে হইয়াছিল কিন্তু মুখ্য লতার বিশেষ নির্দ্দেশে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গেল।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসস্থলী হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কথা উল্লেখ আছে। শ্লোকে আছে- *"রাধামাধায়-হৃদয়ে।"-* শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন।

যিনি সর্ব্বসাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা তাঁহারও আরাধনার ধন। যিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তিনি আজ কাহার টানে আকৃষ্ট? সকলের যিনি আরাধ্য তিনি কাহার আরাধনায় নিযুক্ত? এই আরাধনার ধন শ্রীরাধা। সাধ্য ধন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারও *শিরোমণি শ্রীরাধা। "সাধ্য শিরোমণি।"*

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় সুতরাং স্বরূপশক্তির তিনরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তার মধ্যে তিনটী প্রধান- **চিৎশক্তি, মায়াশক্তি** ও **জীবশক্তি**। চিৎশক্তিরই অপর নাম স্বরূপশক্তি যাহা সদংশে সন্ধিনী চিদংশে সংবিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী। আর এই হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সুখাস্বাদন করান। হ্লাদিনীশক্তির নির্য্যাস হইল প্রেম। আনন্দের অনুভব-রূপ চিন্ময় রসেই প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশ। প্রেমের ঘনীভূত

অবস্থা মহাভাব। সেই মহাভাবের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরাধা। যে পরমাশক্তি শৃঙ্গাররসরাজময়-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে ঐ রসানন্দ আস্বাদন করান তিনিই শ্রীরাধা। আর এই *শ্রীরাধা অর্থাৎ রাধাপ্রেম "সাধ্য শিরোমণি।"*

জীবের চরমতম পরমসাধ্যের অর্থাৎ সাধ্যতত্ত্বের নিরূপণ হইল- সর্ব্বরসের শিরোমণি মধুর রস- কান্তাভাব, যাহা একমাত্র ব্রজের গোপীগণে সম্ভব আর ব্রজাঙ্গনাগণের শিরোমণি হইল শ্রীরাধারাণী। শ্রীরাধারাণীর প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।

এখন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এই উপাসনায় কি অবদান বা আস্বাদন তাহা আমরা বিবেচনা করিব। উপাসনার বা সাধনার দুইটী দিক বা সূত্র আমরা দেখতে পাই যাহা প্রারম্ভে বলা হইয়াছে। পুনরায় সেটিকে আস্বাদন বা অবলোকন করা যাক।

(১) - ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম

(২) - (ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম

(জপ) রাধামাধব রাধিকা নাম।

শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত মহাবাণীতে দুইটি দিকেরই প্রচুর সমাবেশ হইয়াছে। যেটা আমরা পরে দেখব। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনামের বিষয়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব কি বলছেন দেখা যাক। শ্রীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্গিণী গ্রন্থে অগ্রলেখ- পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪এ যাহা পাওয়া যায়-

"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অসূর্য্যস্পর্শ্য অবস্থায় নির্জন কুটীরে মহাগম্ভীরায় প্রবেশের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিংশ বৎসর যে শিক্ষা ও উপদেশ তদীয় মহাবাণী ও মহতী জীবনধারার মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহা একটি অভিনব অখণ্ড বস্তু। সরল কথায়, *"ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম"* এই দুইটী শব্দ দ্বারা সেই অখণ্ড বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু এই কথা ভাসা ভাসা বুঝিলে সেই অখণ্ড শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বীর্য্যধারণ এই কথা ঋষি পতঞ্জলির যুগ হইতে প্রসিদ্ধ। হরিনাম কীর্ত্তনে ভবদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়। এই কথা শ্রীমন মহাপ্রভুর কাল হইতে সর্ব্ববিদিত। প্রভুবন্ধুর বৈশিষ্ট্য এই দুই এর অবিচ্ছেদ্য

কব কালিন্দী কুলকী হোঁ হো ত্রিবিধ সমীর। য়ুগল অংগ অংগ লাগিহোঁ উড়িহৈ নুতন চীর।।

মিলনে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কঠোর। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে জীবনরস শুষ্ক হয়। নাম কোমল, নামের সাধনে কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, তাহাতে মানব কমনীয় নারীসুলভ ভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ব্রহ্মচর্য্য সাধন সরস করিয়া হরিনাম সাধনকে সুদৃঢ় করিয়া স্বীয় জীবনপটে তাহাদের এক মহামিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন।

কেবলমাত্র শুষ্ক কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা দ্বারা যোগী তপস্বীর বীর্য্য ধারণ প্রভুবন্ধুর অভিপ্রেত ব্রহ্মচর্য্য নহে। কামের বিনাশ দ্বারা প্রেমের বিকাশই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন। আত্মপ্রীতি ইচ্ছাই কাম, রসরাজের প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। আত্মপ্রীতির ত্যাগে ও রসময়ের প্রীতির উপভোগে ব্রহ্মচর্য্য সার্থক। পক্ষান্তরে মৃদঙ্গাদি নাম সংকীর্ত্তনেই হরিনাম সাধন পূর্ণ নহে। ব্রজের উন্নতোজ্জ্বল রসাস্বাদনই হরিনাম সাধনের চরম পরিণতি। হরিনাম শব্দ হরি ঠাকুরের নামমাত্র নহে। হরি বলিতে *গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম* বুঝায়। ইহাই প্রভুবন্ধুর মুখোক্ত বাণী। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধ্যে যে রাধাশ্যামের মিলনমাধুরী মূর্ত্ত রহিয়াছে- গুরুকৃপায় গোপীভাবে সেই মাধুরীর আস্বাদনেই হরিনাম কীর্ত্তনের সার্থকতা। নিরুপাধি প্রেমভূমি বিকশিত হইলেই এই আস্বাদন চলে। প্রেমের বিকাশেই হৃদরোগ কামের বিনাশ হয়। মঞ্জরীরূপে রসরাজের রসতৃপ্তির উপভোগে আত্মভোগেচ্ছা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও হরিনাম-সাধন এই দুই এর অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের ভূমিতে স্থিত হইয়া রসরাজের নিখিল রসের ভোগাস্বাদনই হরি সাধন। প্রভুবন্ধুর জীবন-প্রয়াগে এই গঙ্গা-যমুনার মহামিলন অভিনব বটে। এইখানে ত্যাগে ভোগ ও ভোগে ত্যাগের অপূর্ব্ব সমন্বয়। প্রজ্ঞানঘন একত্ব ভূমিকাতেই সমন্বয়ের ভিত্তি। এই ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির সংগঠনেই পরাৎপর শান্তির পূর্ণ রাজত্ব। কারণ ভেদের জঞ্জাল এখানেই তিরোহিত।

প্রেম-পূর্ণেন্দু প্রভুবন্ধু লোক-শিক্ষায় ত্রিংশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম সাধনের মূর্ত্তিস্বরূপ বিরাজমান থাকিয়া ক্রমে মহাগম্ভীরায়

সুমন বাটিকা বিপিন মহঁ, হ্যাঁয় হোঁ কবহু ফুল। কোমলকর দোউ আয়তে, ধরিহৈ বীনা দুকুল।।

লাবণ্যামৃত সমুদ্রে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে নিমজ্জমান হন।”

ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অভিনব অবদান, অবশ্য প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে ঐ পরম-পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির ভেদ অভেদত্ব নবায়মান মিলন বৈচিত্র মূর্ত্তিমন্ত।

আশা করি শ্রীগুরুদেবের এই অনবদ্য বিশ্লেষণে প্রত্যেকেই *“ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম”* সূত্রের অর্ন্তনিহিত তত্ত্ব ও তথ্যকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। আর এরই ভিতরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সাধন ও সাধ্য তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত হয়েছেন।

প্রীতি-রসাস্বাদকত্ব ধর্ম্ম শ্রীহরির নিজ সম্পত্তি। ইহার বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে নিকুঞ্জে পরিণতি পাইয়াছে মহাগম্ভীরায়। কারুণ্য শক্তির প্রকাশ ভক্তদুঃখ অসহনে ইহার পরিণতি নিখিল জীব দুঃখ কাতরতায়।

জীব উদ্ধারণের দায়িত্ব নিজেই লইয়াছেন। সহায়ক তাঁহার, একটী মাত্র বস্তু- শ্রীহরিনাম। নামের যে কী শক্তি আপনার স্বরূপে মূর্ত্তিমন্ত রূপেই তাহা দেখাইয়াছেন। নাম যে কেবল দুর্লভ প্রেমরত্ন লাভের উপায়, তাহাই নহে, জাতিসংগঠনে, মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় ইহা যে এক অতি অদ্ভুত শক্তিশালী অমোঘ অস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন।

অবিরাম হরেকৃষ্ণ নামের ধ্বনি আকাশে-বাতাসে তরঙ্গ তুলিতেছে। করতাল মাদলে কীর্ত্তন নর্ত্তন চলিতেছে। হরিনামের আগে যে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম তুচ্ছ কিন্তু উহার ফলে *“পাবিরে বিরাম”।* এই বিরাম মোক্ষ কৈবল্য নির্ব্বাণের নীরস বিরাম নহে। প্রেমের সরস বিরাম। যে প্রেমের বিরামে পরাৎপর ব্রহ্ম গোপবধূলম্পট সাজে রাসৌলীতে নৃত্য করিয়াছেন এই সেই বিরাম, প্রেমের চিরশান্তি পূর্নানন্দময় বিরাম, প্রীতিরসের বিরাম। এই বিরাম হরিনামে লভ্য হইবে।

কবে যে প্রভুবন্ধুর প্রদর্শিত পথে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিপালনে নরনারীর দেহমন পরিপুষ্ট হইবে, কবে যে হরিনাম মধুরিমা আস্বাদনে সকল জীবের ক্ষুধার্ত্ত আত্মা পরিতুষ্ট হইবে, কবে যে এই দুইএর সম্মেলনে এক বিরাট সামঞ্জস্যময় মানব সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহা একমাত্র পরমেশ্বর প্রভুই জানেন।

এখন আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণী অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম ও অন্য সূত্রের আস্বাদনে রত হইবে। মহাবাণী দুখানি গ্রন্থে সুব্যক্ত হইয়াছেন। সংকীর্ত্তন পদামৃত ও শ্রীশ্রী হরিকথা। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেমন নিরন্তর ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলারস মাধুর্যে ডুবিয়া থাকিতেন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও তেমনি প্রতিনিয়ত *“চৈতন্য লীলামৃতপুর”* ও *“কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর”*। এই দোঁহার মিলনে যে সুমাধুর্য তাহাতে নিমজ্জিত রহিয়া গভীর আস্বাদনের নবনবায়মান আনন্দে তন্ময় থাকিতেন। অন্তর্দশায় রহিতেন স্বানুভাবে পূর্ণ তন্ময়। অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীকরে লেখনী ধরিতেন। সেই অপ্রাকৃত লেখনী মুখে গঙ্গোতরী স্রোত ধারারই ঘনীভূত প্রকটরূপ *“শ্রীশ্রী হরিকথা ”* গ্রন্থ।

ব্রজলীলা ও গৌরলীলার অপূর্ব্ব আস্বাদন। পালার মত সাজানো। প্রভাতের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জ ও মিলন বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ। কিছু পদ আস্বাদনের মাধ্যমে আমরা প্রভুর ভাব ও অবদান অবলোকনে প্রয়াস পাইব। সংকীর্ত্তন পদামৃতের ভূমিকা লেখক ডঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাব ও রস নির্ধারণ দেখুন- ছোট্ট একটি প্রভাতী গান-

উঠ-উঠ কপট শঠ কুটিল কুজন রে।
গৌরাঙ্গ গদাধর, স্মররে ও পামর,
মূঢ়মুগ্ধ মায়া মগন রে।।
হরেকৃষ্ণ হা রবে হর রে রে কৈতবে,
যোষিৎ শয্যা ত্যজ পণ রে।।

গোপী গোপাল গীতি প্রাতঃ পূজনকৃতি
গোষ্ট-গো বৎস পালন রে।।
কুঞ্জ-মিলন-রোল কহ সখী হিন্দোল
রে রে বন্ধু দুর্দ্ধর্ষ দূষণ রে।।

ভবরোগ বৈদ্যরূপে আসিয়া বন্ধুহরি পাপতাপ পীড়িত জীবকে

আহ্বান করিতেছেন যেন তাঁহার ব্যাধি লক্ষ্য করিয়া হে মন, হে পিত্তরোগী, তুমি তিক্ত সেবন কর। এসব জীব-বৈদ্যের ব্যবস্থায় ব্যর্থতা সম্ভব কিন্তু এখানে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর " আচার্য্য ও ভবভয়হারী" স্বয়ং, অতএব ব্যবস্থা তাঁহার ধন্বন্তরি হইতেও অমোঘ। কপটতা, কুটিলতা, কুজনতা যাহার উৎপত্তির কারণ মূঢ়তা, মোহ ও মায়াবদ্ধতা, তাহারই মহৌষধ *"গৌরাঙ্গ গদাধর স্মরণে।"* এই প্রকার স্মরণের ফলে অর্থাৎ মহাবৈদ্যের নির্দেশ কার্য্য করার ফলে তোমার কৃষ্ণে মতি ও নামে রুচি হওয়ামাত্র তোমার পূর্ব্ব দোষ সবই কাটিয়াছে কিন্তু এখন সংস্কার ও তৎফলে কিঞ্চিৎ অভিসন্ধি অর্থাৎ *"কৈতব"* রহিয়া গিয়াছে তাহা কাটাইবার জন্য বলিলেন পণ করিয়া যোষিৎ-শয্যা ত্যাগ কর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর ও তৎসহ হা হা আক্ষেপ সহ তারক ব্রহ্ম হরিনামের আশ্রয় লও। এই মহামন্ত্রে শ্রীহরি তোমার পাপতাপ ও বহির্বিষয় পুনঃ-পুনঃ হরণ করিয়া পুনঃ-পুনঃ আকর্ষণ করতঃ তোমাকে কৃষ্ণের সমীপে আনিবেন- তাই

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নাম।

পরে আকর্ষণ ও বিষয় হরণ করিবেন, তাই

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে " নাম।

এই ভাবে বহিঃ ও অন্তর্বিষয় হরণ করিলে তুমি যখন অকৈতব অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অভিসন্ধি ও সংস্কার শূন্য হইবে তখন নামরূপী শ্রীহরি তোমার আত্মায় রমণ করিবেন। সেই হেতু-

"হরে রাম হরে রাম" নাম।

অবশেষে পুনঃ-পুনঃ আত্মার সহিত মিলনের ফলে তোমার অন্তরের অন্তস্তলের সুপ্ত ও দুর্বার বিষয়-সমূহ জাগ্রত হওয়া মাত্র পুনঃ হৃত হইবে। সেই হেতু-

"রাম রাম হরে হরে" নাম।

নির্দেশ এত অব্যর্থ যে বন্ধুহরি ইঙ্গিত করিতেছেন, তুমি কৈতবশূন্য হইয়া ব্রজের হইয়াছ। শুধু তাই নয়, তুমি আত্মরতিরও পরের অবস্থা ভাগবত রাজ্যের শান্ত, দাস্য ভাব অতিক্রম করিয়া বাৎসল্য ও সখ্যে উপনীত হইয়াছ। অতএব *"গোপী-গোপাল-গীতি"* প্রভৃতি প্রাতঃকালীন পূজন ও কৃতি অবলম্বন করিয়াছ। তুমি মানসে স্মরণে বা বাস্তবে গোষ্ঠযাত্রা ও গোবৎস পালনাদি করিয়া থাক। দেখিতে-দেখিতে তুমি যেন গোপী দেহ লাভ করিয়া রাধারাণীর একজন সখী হইয়াছ। সখী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন- হে সখি, কুঞ্জ-মিলন-রোল তথা হিন্দোলন কহ।

এই প্রকার রাধাদাস্যের মঞ্জরীভাব সাধনায় কোন মঞ্জরীর আনুগত্যে যুগল সেবাই জীবনের পরম লক্ষ্য নির্ধারিত হইল। ব্রজভাবের প্রতি লোভবশতঃ যে ভক্তি তাহা রাগানুগা- এ কেমন ভক্তি?

সাধনার ফলে সিদ্ধি। সাধনা উপায়, সিদ্ধি উপেয়। সাধনা পথ, সিদ্ধি গন্তব্যস্থান। ইহাই সর্ব্বজন বিদিত। রাগাত্মিকা ভক্তির পথে কিন্তু এই নীতি অন্যরূপ। এই পথে সাধনের মধ্যেই সিদ্ধি। উপেয় উপায়ের মধ্যে অন্তর্লীন বা সমাহিত। সাধ্যবস্তু পথের মধ্যেই প্রকট। সাধনভক্তির অন্তরেই উন্নত রসের আস্বাদন, প্রতি পদক্ষেপেই তাহা উজ্জলতর। কথাটী শুনিতে কেমন-কেমন বটে, কিন্তু ইহাই রাগমার্গের বৈশিষ্ট্য। ইহা বদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের পরম করুণার দান হইতেই প্রাপ্ত।

শাস্ত্রবিধি ভয়ে যে ভক্তি তাহা বৈধী। তাহাতে সাধন, শ্রবণ-কীর্ত্তন, সাধ্য প্রেমধন। আর ব্রজ গোপীভাবের আনুগত্যে লোভবশতঃ যে ভক্তি, যাহার নাম রাগানুগা, তাহাতে প্রেমরসের অনুভূতি ও আস্বাদন সাধনাত্মক শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যেই প্রবহমান। এখানে নামের ফলে প্রেম নহে, প্রেমের অভিব্যক্তিতে নাম। প্রেম পাব বলিয়া নাম করা নহে, প্রেমের উদ্বেলতাই নামের স্ফূর্ত্তি। নামে প্রেমে মাখামাখি। কাঁচা প্রেম পাকিলে এমন হয়।

"নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।"

এই দুইকে অর্থাৎ (সাধন "নাম" ও সাধ্য "রাধাপ্রেম") এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখণ্ডরূপ দিয়াছেন শ্রীগৌরহরি। আর এরই সাকার অর্থাৎ রসবিগ্রহ মূর্ত্তিই হচ্ছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। দেখুন তাঁর লীলারস আস্বাদন। দেখুন শ্রীশ্রীপ্রভুর পদরচনায় রসালা পরিবেশন করছেন শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়- "সংকীর্ত্তন পদামৃত" - পদসংখ্যা - ১৩৬ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭তে এ সম্বন্ধে একটি পদ আলোচনা করা যাইতেছে-

"বল হরিবল"

কেমন করিয়া বলিতে হইবে?

"শ্রী করতালে বাজায়ে মধুর মাদল রে।"

বলিলে কি হবে-

"প্রেমস্বরে প্রাণভরে ঝরে অবিরল রে।"

অর্থাৎ উহাতে প্রেমভক্তি লাভ ও প্রেমাশ্রু বর্ষণ হয়। প্রেমভক্তির পর আর মোহ থাকে না সত্য কিন্তু ভ্রান্ত জীবের যাহাতে উহার পুনরাক্রমণ না হয় সেজন্য বলিতেছেন-

"দুবাহু বিস্তার করি, বলভাই হরি হরি রে।
হরিনামে মজি সদা ত্যজি মোহ হলাহল রে।।"

প্রেমকে বর্ধন করিবার ও স্থির রাখিবার জন্য আর কি-কি করিতে হইবে-

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত রে।"

তাহাতে কি লাভ হইবে?

"অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভাব সুনির্মল রে।"

ভক্তি পথে ভজন রাজ্যে ইহা অপেক্ষা লোভনীয় বস্তু আর কি থাকিতে পারে? ভাগবত আস্বাদন লইয়া থাকিলে শুদ্ধাভক্তিই ক্রমশঃ সুনির্মল ভাব ও রসে পরিণত হইয়া পরমধামে উপনীত হইবে। ফলে

ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য, বিষয়ভোগ, সুখ, যশ সকলই তুচ্ছ হইয়া যায়। পরকালের স্বর্গসুখ ও মোক্ষ প্রভৃতিও মূল্যহীন হয়।

ঐ অবস্থা লাভের সহায়ক কি?

"একাগ্রতা আনুগত্য সাধু-গুরু সেবা সত্য রে।
আবাহন নিবেদন শ্রবণ মঙ্গল রে।"

ইষ্টলাভের জন্য চেষ্টা যত্নের একমুখীতাই একাগ্রতা। সেখানে এতটুকু মিথ্যাভাব থাকিলে সব ব্যর্থ হইবে। ইহার সঙ্গে চাই "আনুগত্য"। শ্রীগুরুর আনুগত্য, সাধু বৈষ্ণবের আনুগত্য, ভাবরাজ্যে সখীর আনুগত্য, মঞ্জরীর আনুগত্য, সর্ব্বশেষে রাধা ঠাকুরাণীর আনুগত্য (বলতে একমাত্র শরণও আশ্রয়)।

আনুগত্য বৈষ্ণব জগতের প্রথম ও শেষ কথা। সাধুগুরু সেবা ভজন পথের দ্বার স্বরূপ। নারদ, শুক, প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কোন না কোন সাধুভক্তের নিকট ভক্তিধন লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ভক্তিধনের মূলকেন্দ্র বা ভাণ্ডার **শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী**। সাধু গুরু দেওয়ার অর্থ সাধু গুরুর মাধ্যমে তাঁহারই দেওয়া তাই বলিলেন *"সাধু গুরু সেবা সত্যরে "* অন্য পথ নাই। ইহার পর আর কি কার্য থাকিতে পারে? আছে মাত্র একটী। *"বৃষভানুপুরে বাস"*-প্রেমিক ভক্তের চরম কামনা- ব্রজে বাস, ফল- ত্রিতাপাদির শীতলতা।

"প্রভুবন্ধু আশ, বৃষভানুপুবে বাস রে
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন যাবট শীতল রে।।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ব্রজেরই ধন, ব্রজের আপনজন, তাই সদা সর্ব্বদা ব্রজভাবে বিভাবিত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের আকুতি, শ্রীবৃন্দাবনধাম ও ব্রজরজের লালসা তাঁর নিত্য। প্রকট অবস্থায় শ্রীধামের আকাঙ্ক্ষা। মঞ্জরী ভাবাবেশে ব্রজলীলামাধুরী আস্বাদনপর শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রার্থনা দেখুন- শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী-

"কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।
গোপী পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে।।"

ব্রজ আগমনের পূর্ব্বে যেখানে যাইতেছেন, যাহাকে দেখিতেছেন অন্তরের অন্তস্তলে একমাত্র জিজ্ঞাসা- কবে ব্রজে যাইব। কবে গোপী পদরজঃ মাথায় লইব। কবে সখীসঙ্গে অভিসারে গিয়া যুগলমিলন দর্শন করিব। কবে যুগলকিশোরের মোহনমাধুরী দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াবে, ব্যজন সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। কবে প্রাণেশ্বরী ভানুদুলালী আমার মাথায় শ্রীচরণ দিয়া কৃপাকর্ষণে কুঞ্জে লইয়া যাইবেন। আমি যুগলচরণে দেহমন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অনন্তকালের জন্য তাঁহাদের হইয়া যাইব।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর রাজর্ষি বনমালী রায়ের সঙ্গে ব্রজে না আসিয়া একাকী আসিয়াছেন, ইহাতে স্বীয় আচরণের মধ্য দিয়া পরম আদর্শ শিক্ষা প্রকটন করিলেন। -ব্রজবৃন্দাবনে আসার এবং আসিয়া তাঁর সেবনের বিধি দেখাইলেন- ব্রজবনে একাকী সব প্রকারের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীধামবৃন্দাবন, বৃন্দাবন রজঃ ও বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর শরণ ও আশ্রয় লইয়া প্রবেশ ও বাস করণীয়। শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীকুণ্ড ও শ্রীশ্রীপ্রভুর আস্বাদন দেখুন-

"কৃপা পাব, ব্রজে যাব, অমনি পশি শ্রীবৃন্দাবনে।
কুঞ্জে মেগে খাব গুণ গাব বেড়াইব বনে-বনে।।"

প্রেমবিহ্বল, প্রাণ সুদীপ্ত, সাত্ত্বিকভাবে শ্রীবন্ধুতনু বিভাবিত, কৃষ্ণরসে রসিত জীবন শ্রীবামানন্দন বন্ধুধন পরম ব্যাকুলভাবে শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

"ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায়।
কাঁদিতে-কাঁদিতে বক্ষ পাতিব তাহায়।।"

পথে ধুলার মাঝে প্রাণকান্তের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহাতে বুক পাতিয়া দিতে-দিতে সাক্ষাৎ নিতাই স্বরূপে প্রভু বন্ধুসুন্দর ব্রজে প্রবেশ করিলেন।

"হা গৌরাঙ্গ বলে- কবে কুতূহলে
ভ্রমিব দ্বাদশ বন।
বৃষভানুপুর যাবট মধুর
নন্দগ্রাম সুদর্শন।"

-শ্রীবন্ধু

হা গৌর, প্রাণ গৌর বলিতে-বলিতে প্রভুবন্ধু দ্বাদশ বন পরিক্রমণ করিলেন। বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম মধুর যাবট দর্শন করিলেন। ব্রজবাসীর ***"কুঞ্জে কুঞ্জে কর পুটে মুঞ্জ মাধুকরী "*** ভিক্ষা মাগিলেন। শীতল যমুনা বারি ***"ঢর ঢর পান "*** করিয়া "আবাহন নিবেদন শ্রবণ মঙ্গলে" রত হইলেন। ***"সদা রজঃ স্নাত তনু"*** হইয়া ***"তরুতলে"*** বাস করিয়া ***"অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি"*** ও সুনির্মল ব্রজভাবের আদর্শ প্রকট করিয়া নিত্যানন্দ ভাবস্বরূপে চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণ করিলেন।

প্রভবন্ধু ব্রজদর্শন করিলেন। ব্রজভূমি, শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর- জঙ্গম, শিখীগণ, কোকিলাদি বিহঙ্গ-কুল, তরুলতা, ধেনুগণ ও ব্রজের রাখালগণ সকলই দর্শন হইল।

"একবার রাধা-রাধা বলে নাচরে রাখালগণ
(ভাইরে রাধা রাধা বলে)
রাধামন্ত্র জপতপ হৃদয় ভূষণ,
যদি চাহ শ্যামে রাধা নামে রে রাখ রুচি অনুক্ষণ।।
(নামে, জয় রাধা নামে) (মোরে ধন্য কর)
আমি কায়মনে সে চরণেরে করেছিরে সব সমর্পণ।।"

- শ্রীবন্ধু

রাখালগণও সব ভুলিয়া হাতে তালি দিয়া রাধে-রাধে বলিতে লাগিল। ঢুলিতে-ঢুলিতে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কুসুমসরোবরের একটি গোঁফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদিন একাকী রহিলেন। পরে শ্রীকুণ্ডাভিমূখে চলিলেন।

"কুণ্ডে-কুণ্ডে স্নান, করি সমাধান,
আসিব রাসমণ্ডলে।
নয়নে নেহারি, দুবাহু পসারি
লুটাব হা রাধে বলে।।"
- শ্রীবন্ধু

শ্রীললিতাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে দাঁড়াইলেন। শ্রীকুণ্ডদর্শন করিয়া বাহু প্রসারণ করতঃ জড়বৎ পড়িয়া গেলেন। *"হা রাধে হা রাধে"* বলিয়া সুদীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

"সদা রজঃস্নাত তনু তরুতলে বাস" করতঃ মাধুকরী দ্বারা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি পরিপূরণ এবং সদা লীলাস্মরণে ডুবিয়া থাকাতেই যে ব্রজ দর্শনের সার্থকতা তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে বুঝাইলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগস্বন্ধুসুন্দর।

শ্রীশ্রীকুণ্ডতীরে বসিয়া রাধাপ্রাণ প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর দিবানিশি নয়ন নীরে ভাসেন। অবনত বদনে বসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে তপ্ত অশ্রুধারায় পরিস্নাত হইতেছেন। প্রেমবিহ্বল ঠাকুর ভাবাবেশে গুন-গুন করিয়া গাহিতেছেন-

"হা রাধে প্রাণাধিকে প্রণয় পুতলি।
বারেক কটাক্ষ কর করজোড়ে বলি।।"

যুক্তকরে করুণা-কটাক্ষের আশায়- *"তৃষিত চাতক কণ্ঠে"* কহিতেছেন-

"হা কিশোরী প্রাণেশ্বরী হৃদয় ধন।
দাসে বিতর দয়া দূরিতাকিঞ্চন।।"

কিছুক্ষন নীরব থাকিয়া অনতিদূরে যেন কাহাকেও দর্শন করিতেছেন ও যেন লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন-

"জীবন যৌবন মন সঁপেছি চরণে,
তোমা বিনে নাহি জানি জীয়নে মরণে।।
(তুমিই গতিহে) (রাই কিশোরী মোর)।"

পুনঃ-পুনঃ **"তুমিই গতিহে" "তুমিই গতিহে"** বলিয়া সে প্রেমপূজায় আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতেছেন। আবার কাহার দিকে যেন তেরছা দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। কি যেন ভাবিয়া সোনার বাহু দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতেছেন

"কৈ কৈ রাই আমার, উদ্ধারণ মুক্ত হব।"

আবার পরমূহুর্ত্তে চারিদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ক্ষণপরে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন-**"এই ভব কুহকরে রাই তুমি উদ্ধারণ।"**

নিশীথিণীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কুণ্ডযুগলের সঙ্গমস্থলে করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল- **"রাই তুমি উদ্ধারণ!"** সে ধ্বনি কুণ্ডকোণের, তরুণ তমালতরুতে প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল- **"রাই তুমি উদ্ধারণ!"** তারপর আবার সব নীরব।

অই কে আসিতেছেন। রূপলাবণ্যের বিমল ছটায় কুণ্ডযুগলের তীর উজ্জ্বল করিয়া অই কে দেখা দিতেছেন। প্রেমপূজার বিগ্রহটী বুঝি প্রত্যক্ষ প্রকটিত। কণ্ঠমাধুর্যে ভারতীকে লজ্জা দিয়া প্রেমপূজারী বন্দনা গাহিতেছেন-

"জয় জয় শ্রী রাধে।
জয় কমলিনী কুঞ্জ বিলাসিনী
প্রেম পাগলিনী মানিনী রাধে।।

জয় রাজরাণী রাজার নন্দিনী
রক্ষ বন্ধুদাসে রাই সীমন্তিনী
বাসর রঙ্গিনী গোপিকা সঙ্গিনী
গোবিন্দ রঞ্জিনী গোপিনী রাধে।।"

"জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে" ধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া নীরবতার প্রান্তে পৌঁছিল। বন্ধুসুন্দরের নয়নে অশ্রুধারা বিরহতপ্ত উদার উন্মুক্ত বক্ষে পড়িয়া সে অশ্রু শুষ্ক হইল। তখন সে শ্যামাঙ্কশায়িনি কামিনী কোমল করে প্রাণবন্ধুর কণ্ঠ জড়াইয়া ধীরে-ধীরে নয়ন ধারা মুছাইতে-মুছাইতে বলিলেন- *"বঁধুয়া নাম বাতাও।"* নাম উচ্চারিত হইল। সে রূপসীবালা নাম বলিয়া বলাইয়া একাকার হইয়া গেলেন। *"রাধে জয় রাধে।"* আবেগভরা ধ্বনি কুঞ্জবনের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বন্ধুসুন্দর মহাপ্রেমে আবিষ্ট। চৈতন্য মন, আজ অচৈতন্য।

এ কি স্বপ্ন! স্বপ্ন নহে। তুরীয় ভূমির উর্দ্ধে যে অপ্রাকৃত চিদানন্দ লীলাবারিধি, ইহা তাহাতে মিলন বিরহময় প্রেম-বৈচিত্র্যের একটী বিচিত্রময় তরঙ্গ। ঐ যে সে-ই তরঙ্গাঘাতেই বন্ধুসুন্দর লিখিতেছেন-

"জয় রাধে ধর্ম্ম, জয় রাধে জয়।
জয় রাধে কর্ম্ম, জয় রাধে রয়।।"

জয়তু প্রেমিক ও রসিক ভক্তবৃন্দ। নমামি তে চরণারবিন্দম্। প্রভু বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত পদ ও তাঁর ব্রজ-বিজয় লীলার অতি স্বল্প অংশের অবতারণা ও আস্বাদনে সকলেই অবহিত হইলেন যে, উপাসনা বা আরাধনা পরিসরে পূর্ব্বোক্ত দুটী সুত্রের সমুচিৎ ব্যবহার ও আচরণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তবে দ্বিতীয়টীকে আর একটু অবলোকন করা যাক।

"(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধা মাধব রাধিকা নাম।।"

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ভক্তিরসের সম্বন্ধানুগ ভজনে যাকে রাগানুগা ভজনও বলা হয়, চারটী রসের আস্বাদনই মুখ্য- দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। প্রভুও তাই বলছেন- এই চারি রসের ভজনের কথা, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল ও শ্যাম নামের দ্বারা। আবার রসের যেমন ক্রমোন্নতি ঠিক তেমনই নামের ও পরপর উচ্চতায় অবস্থান। চরমে শ্যাম নাম, যাহাতে কান্তাভাবের আস্বাদন করা হয়। জপনীয় বলেছেন- যুগল মন্ত্রের

ও রাধা নামের অর্থাৎ সর্ব্বোপরি রাধা শরণাগতি ও অবিচ্ছিন্ন জপ প্রতিষ্ঠা।

আর এই মধুর রতির আস্বাদন ও রাধাশরণ একান্তভাবে চরম পর্য্যায়ে প্রভু ব্রজবাস কালে স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে দেখাইয়াছেন এবং উপদেশ করিয়াছেন। প্রভুর করাঙ্কিত প্রায় প্রত্যেক পত্রেই তিনি হয়তো শ্রীমতি নতুবা রাইকিশোরী ভরসা বা শ্রীমতি ভরসা শিরোনামা করিয়াছেন। এমনকি পদকীর্ত্তনের একখানি গ্রন্থের নামও শ্রীমতি সংকীর্ত্তন উল্লেখিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০তে বাকচরবাসীদের প্রতি ধর্ম্মলিপিতে- শ্রীমতি ভরসা শিরোনামায় ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন- (১) দাস্যভক্তি (২) ললিতার যুথ (৩) বৃন্দার অনুগত (৪) রাইসেবা (৫) সখী- ইতি পঞ্চ রহস্য।

এখানে কান্তাভাবের মধুর রসের আস্বাদনে ভক্তের স্থিতি ও অবস্থান নিরূপণে ভজন বা সেবার বিধান দেওয়া হয়েছে। দাস্যভক্তি বলতে রাধাদাস্যের ভজন অবলম্বনে- ললিতাদেবীর যুথ অন্তর্ভুক্ত হয়ে বৃন্দাদেবীর আনুগত্যে শ্রীরাধিকার সেবাপরায়ণ হতে হবে। অর্থাৎ কান্তাভাবের রস আস্বাদনে মঞ্জরীভাব সাধনায়- জীব দাসীর, দাসীর দাসী হয়ে সেবা বিধান করবেন। সখী বলতে- যাঁহারা নিত্যসিদ্ধা, তাঁদের অনুগত মঞ্জরী-স্বরূপের আদেশ ও নির্দেশে আমাদের দাসীত্ব ও সেবা বিধান। এখানেই জীবের স্থিতি। অবশ্য এই ভজনের আরও অনেক গূঢ় নির্দেশ পেয়ে ছিলেন শ্রীরামদাসবাবাজী যখন তিনি প্রভুর সঙ্গে প্রায়ঃ তিনমাস শ্রীবৃন্দাবন বাস করেছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পঞ্চরহস্যাত্মক এই ভজন নির্দেশে রাই সেবার পরেও সখীতত্ত্বের অবধারণা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এখানে শুরু থেকেই অর্থাৎ প্রথম দাস্যভক্তি থেকে সখী পর্য্যন্ত- সখী সম্বন্ধিত। তবুও অন্তিমে সখীর পুনরাবৃত্তি অতীব মহত্ত্বপূর্ণ ও রহস্যব্যঞ্জক। এখানে সম্পূর্ণটাই ব্রজাঙ্গনা অর্থাৎ সখী আনুগত্যে সেবা-ভজনের উল্লেখ, কিন্তু মনের

কোথাও যাতে অন্য কোন কথা বা বৃত্তি বা ধারণা না আসে সেই দৃঢ়তার জন্য ইহার পুনরাবৃত্তি কেন না ইহা সম্পূর্ণ যুগল বা রাধাকৃষ্ণের উপাসনার বস্তু তদুপরি শ্রীরাধারাণীর দাসীত্ব, অনুগতি ও সেবাশ্রয় বৃত্তির মুখ্যতা, তাই এত জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা ব্রহ্মাদিরও দুর্গম গতি। সখীভাবাপন্ন ব্যতীত এই ব্রজলক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্তি সর্ব্বথাই অসম্ভব। যেমনটি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ঘোষণা করছেন-

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন- শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি- ১৬

"তোমার সখ্যে নমস্কার করি, সখ্য আমার মাথায় থাক।
তোমার দাস্যই আমার চিরকাম্য।"

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদেরও রাধাকৈঙ্কর্যের নিমিত্ত তীব্রতম বাসনায় বুক ভরা। দেখুন, **শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি** শ্লোক সংখ্যা দুইশত উনষাটের বাংলা পদ্যানুবাদ-

"আমার পরমাভীষ্ট, রাধাপদদাস্যে নিষ্ঠ,
দাস্যামৃত প্রাপ্তির কারণ।
শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্যাম সতত করিব ধ্যান
শ্যামনাম করিব কীর্ত্তন।।
শ্যামের শ্রীপাদপদ্ম অর্চনা করিব নিত্য,
মন্ত্ররাজ জপিব সদায়।

ত্রিলোকে পরমাদ্ভুত অনুরাগ প্রেমোৎসব,
লভ্য হবে শ্যামের কৃপায়।।
রাধার কিঙ্করী-পদ সুদুর্ল্লভ সে সম্পদ
লোকাতীত পরম আনন্দ।
ভণে শ্রীপ্রবোধানন্দ ভাগ্যে মিলে সে আনন্দ,
কৃপা কৈলে নন্দকুল চন্দ ।। " ২৫৯।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময়ী সেবাই প্রভুবন্ধুসুন্দরের অভীষ্টতম। যেখানে মন রাধা পাদপদ্ম রসে ডুবিয়া থাকে। চিত্তে শ্রীরাধার দাস্যরসের অপূর্ব অনুভূতি বিদ্যমান। বাহ্যাবেশে রাধাদাস্যের অপূর্ব ঝঙ্কার। রাধাদাসীত্বের অভিমান অন্য সব আবেশকে কবলিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে সুমেরু শিখরের ন্যায় অচল-অটল ভাবে মাথা তুলিয়া থাকে। স্বামিনীর স্মৃতি সর্ব্বোপরি আনন্দময়। তাই ভক্তেরও প্রার্থনা-*"তুয়া পাদপদ্ম পাশে কর অনুচরী।"*

ইহাই সাধ্য, ইহাই সাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই কামনা জীবনভরা। এই পরমাভীষ্ট লাভের জন্যেই সাধন-ভজন, গুরু পাদাশ্রয়। কিঙ্করী শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রীতিরসে মগ্না হইয়াই অশেষ ব্রজবঁধুর কাম্য শ্রীশ্রীগোবিন্দের অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ লালসা মহাসম্পদকেও দূরতঃ পরিহার করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধারাণী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকেন। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমেরই মূর্ত্তি, তাঁহার চিন্তায় অন্তর প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই অন্তরে সতত শ্রীমতীর মধুময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণ হইয়া থাকে। আবার বলা হয় শ্রীনাম ব্রজমণ্ডলে কোন ভাগ্যবান মহাপুরুষের ধ্যান বিভাবিত চিত্তেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব স্বপ্রকাশ শ্রীরাধানাম ভাগ্যবান মহাত্মাগণের চিত্তে এবং জিহ্বায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত হন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেছেন পরম রহস্যময় তত্ত্ব মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনে অতি বিরল মধুররসের রাগ-সাধকগণের প্রেমাঞ্জন স্ফূরিত নেত্রে দৃশ্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ সৌভাগ্যবানগণের জিহ্বায় এবং

চিত্তে শ্রীরাধানামরূপে উদিত হইয়া থাকেন।

আবার শ্রীরাধানাম ***"পরম"*** অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ভগন্নামে ভগবৎস্বরূপের সমস্ত শক্তিই নিহিত থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামও আর নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

"আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব,
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু
রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীরাধার রূপ-গুণ উপলক্ষণে তাহার নামও শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু। সাক্ষাৎ মাধুর্যমুরতি শ্রীশ্যামসুন্দরও পরম প্রীতিভরে রাধানাম জপ করেন বা শ্রীরাধার উপাসনা করেন। পরাবিদ্যা রাধানামেই পরমাভীষ্ট রাধাদাস্যের সিদ্ধি হইবে।

"যাঁহারা *"রাধা রাধা"* কীর্ত্তন করেন, যাঁহারা শ্রীরাধার পূজা করেন, যাঁহারা রাধানাম করেন ও রাধানামেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, সেই সকল মহাভাগ্যবান ব্যক্তিগণ শ্রীবৃন্দাবনে রাধা সহচরীত্ব প্রাপ্ত হন।"

"রাধা রাধেতি কুর্য্যাত্তু রাধা রাধেতি পূজয়েৎ
রাধা রাধেতি সন্নিষ্ঠা রাধা রাধেতি জল্পতি।
বৃন্দারণ্যে মহাভাগা রাধা সহচরী ভবেৎ।।"

প্রেমময়ী শ্রীরাধা। তাঁহার নামে প্রেমরসরূপতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমরসের ঘনীভূত পরিপাক মহাভাবেরই মূর্ত্তি। রাধানামের "র"কার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে নিশ্চলা ভক্তিলাভ করিয়া জীব সর্ব্ববাঞ্ছিত সদানন্দময় ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গোবিন্দচরণে দাস্য লাভ করিয়া ধন্য হয়। "ধ"কার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য ও স্বারূপ্য লাভ করিয়া অনন্তকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন। আর "আ"কার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি পায় এবং শ্রীহরির ন্যায়

দানশক্তি, যোগশক্তি ও যোগমতি এবং নিরন্তর হরিস্মৃতি হয়।

রাধানাম জপকারী ব্যক্তি মধুর রসজাতীয় রাধাস্নেহাধিকা মঞ্জরীভাব সাধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য বা কৃতার্থ হন। রাধানামের মধ্যে মঞ্জরীভাব সাধনার সমস্ত অঙ্গই সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাই প্রভু বলছেন রাধিকা নাম।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীচরণ চৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহাই প্রেম প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম ও সরল উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন, ভাগবৎ-শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহার্চ্চন ও ব্রজবাস। এই পাঁচটি অঙ্গ দুরূহ ও অদভূত বীর্যশালী। ইহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, ইহাদের স্বল্পমাত্র সম্বন্ধেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের চিত্তে অবিলম্বে ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অলৌকিক সাধন-পঞ্চকের এইরূপই অচিন্ত্যশক্তি আছে যে ইহাদের সম্বন্ধ মাত্রেই ভাব ও ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ সমকালেই সাধকের চিত্তে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুসুন্দরের মহাবাণী ও লীলাকীর্ত্তনে ঐ সকল সাধনাঙ্গের ভূরি-ভূরি আস্বাদন প্রক্রিয়া আমরা দেখতে চাই যাহা এত ভাবগম্ভীর ও চিত্তাকর্ষণীয় যে তাহার তুলনা বিরল।

যাই হোক, এবার আরও কিছু পদরচনার এক, দুই, তিন, চার পঙক্তির উদ্ধরণের দ্বারা এই রস আস্বাদনের পরিপাটী ও মধুরিমা পরিবেশন করা যাইতেছে-

শ্রীশ্রীহরিকথা পৃষ্ঠা সংখ্যা-

(৪১) *হাঁ কিশোরী প্রাণেশ্বরী জান না ত বলি।*
বন্ধুগীতি, বঁধুস্মৃতি, সাধের মুরলি।।

(৪৫) *শ্রেষ্টাচার পরচার হরেকৃষ্ণ মালা।*
বন্ধু বলে হেন হলে যাবে সব জ্বালা।।
(সব জুড়াইবে ভাই) (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ)

(৪৭) *রাই প্রেমে টলমল, রা বলিয়ে চক্ষে জল*
ধা বলিতে লুণ্ঠিত ধরায়।।

(৬৯) *হা রাধিকে প্রাণাধিকে জীবন ঈশ্বরী।*
তোমার বিরহে প্রিয়ে প্রাণ পরিহরি।।

"সংকীর্ত্তন পদামৃত" — গ্রন্থে বর্ণিত- পৃষ্ঠা সংখ্যা-

(১৫) *কেলি কদম্বের তলে, মিলে নবীন যুগলে।*
রাধে রাধে রাধে বলে, বন্ধু পড়ে চরণে।।

(৩৫) *সব সহচরী করিল গমন।*
নিজ-নিজ কুঞ্জে করিল শয়ন
নিঃশব্দ নিবিড় নিকুঞ্জ কানন
দ্বারে জগদ্বন্ধু কোটাল রহিল।।

(৬৯) *হা হা প্রাণেশ্বরী, দেহ পদতরী,*
বন্ধু-জীবন-রূপিণী।
হা হা শ্রীরাধিকা, শ্যাম প্রাণাধিকা,
বন্ধু-স্মরণ-বন্দিনী।।

(৭৮) *কোথা বৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী আমার।*

ও-চরণে যাচে স্থান, বন্ধু দুরাচার।।

(৯২) *জগবন্ধু দাসে রাধে রেখ পদতলে রে।*
গোপীদেহ দিও মুই সেবিব যুগলে রে।।

(১০১) হরে কৃষ্ণ মুকুন্দ মাধব।

বন্ধু বাঞ্ছা রাধা দামোদর।

মোর ব্রজ সখী সব।।

(১০৫) রাধে রাধে বল বদনে।
যদি যাবিরে বৃন্দাবনে।।

পরিশিষ্ট-

বিরাজে নিকুঞ্জমাঝে যুগলকিশোর

ভণে জগদ্বন্ধু দ্বিজ কবে দোঁহা মুখাম্বুজ
হেরিব সখীর পাশে বসি।

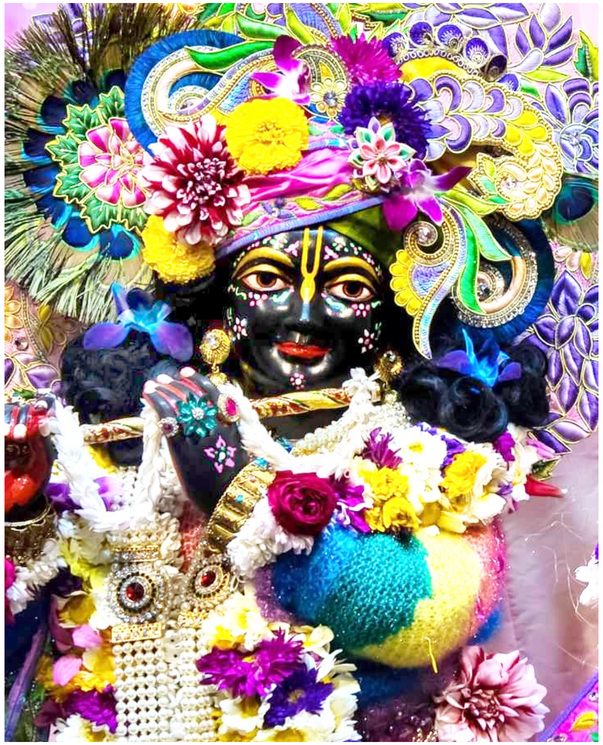

পূজ্যশ্রীশ্রী রামদাস বাবাজী মহারাজ

পূজ্যশ্রীশ্রী রাজেন্দ্রদাস বাবাজী মহারাজ

জয় শ্রী রাধে

নাম-প্রেম-মালা

পরিশেষে ইহাই স্থির হইল যে এবং যাহা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে সাধন-শিরোমণি হইল **"নাম"** আর এই নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণাদিরূপে সদা-সর্ব্বদা গ্রহণীয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেছেন-

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়-
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।"

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সমগ্র ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাধন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যত্র আছে-

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে জীব পায় প্রেমধন।।"

শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রিকাতে শ্রীনরাত্তম ঠাকুর-

"কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।।"

শ্রীনামই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একান্ত প্রেমপ্রাপ্তির পরম উপায়। শ্রীনাম শ্রীভগবানেরই মহাকারুণ্য-ঘন অবতার। নামাশ্রয়ী সাধক নামের মধুরাদপি-মধুর আস্বাদন ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রীতিভরে নামকীর্ত্তনে শ্রীনামের অজস্র করুণাধারায় স্নান করিয়া থাকেন।

তাইতো প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলছেন-

গাও রে আনন্দভরে হরে কৃষ্ণ নাম।। ১৩৩।।

আবার বলছেন- *কৃষ্ণগোবিন্দ গোপাল শ্যাম।*
রাধামাধব রাধিকা নাম।।

প্রথমতঃ প্রীতির সহিত উচ্চৈস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন। প্রভু বলছেন-

গাওরে গভীর নাদে রাধাকৃষ্ণ নাম।। ১৩৪।।

ইহা হইল সাধন-শিরোমণি ***"নাম"*** নামের কথা। অন্ততঃ সাধ্য-শিরোমণি ***"প্রেম"*** শ্রী রাধাপ্রেমের রসাস্বাদন।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, মহাভাববতী নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের আরাধ্যা। তাঁহার আরাধনা ব্যতীত মহাভাবের সিদ্ধি হয় না। মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার শ্রীচরণকমল হইতে অজস্র মহাভাব রসের প্রস্রবন নিস্যন্দিত হইতে থাকে, তাহার এক কণিকাতেও যাঁহারা স্নপিতান্তঃকরণ হইতে পারেন নাই তাঁহাদের গোপীভাবে কৃষ্ণসেবা সিদ্ধি সুদূর পরাহত। কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীরাধার সুকুমার ও সুন্দর পদনখচ্ছটা হইতে উন্মীলিত যে অনন্ত লাবণ্যসিন্ধু, তাহার লবমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের প্রাণের উপজীব্য বা খোরাক। শ্রীচরণের সৌকুমার্যে এবং সৌন্দর্যে শৃঙ্গাররসরাজ মহানাগর শ্যামও বিমোহিত।

প্রেমিকের প্রেমবস্তুই প্রাণের উপজীব্য। প্রেম ব্যতীত প্রেমিকের চিত্ত মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন-

"প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"

ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবের মূল উৎসই ***"শ্রীরাধা।"*** শ্রীরাধাই শুদ্ধপ্রেমবিলাসের মূর্ত্তি। সাধারণতঃ শ্রীভগবানকে ভালবাসার নামই প্রেম। সেই ভালবাসা যত নিরুপাধি বা আত্মেন্দ্রিয় সুখ-বাসনা-রহিত হইবে ততই প্রেম নির্মল হইবে। ব্রজের প্রেম নিরুপাধি হইলেও কান্তাপ্রেম বা ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমে উহার চরমতা। সর্ব্বোপরি শ্রীরাধার প্রেমে শুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা। কান্তা প্রেমের সূক্ষ্ম পঞ্চবিধ উপাধিও শ্রীরাধার প্রেমে নাই। ব্রজের ঐশ্বর্য-জ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধুর্যময় প্রেমের সেবাটী সম্বন্ধানুরূপ অতি সরস ও সরলভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া পরকীয়া-রসে মধুর-ভাবে তাঁহাদের প্রেম পরিমলবাসিত

সৌন্দর্যমাধুর্যাদি মকরন্দ রসপূর্ণ নিরবদ্য দেহকুসুম দিয়া মধুসূদন শ্যামসুন্দরের সেবা করিবার জন্য যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, রস বিলাসের ভূমিতেই সেই আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সেবাই *"শুদ্ধ প্রেম-বিলাস,"* সেই শুদ্ধ প্রেমবিলাসের শ্রীমূর্ত্তিই *"শ্রীরাধা।"*

শুদ্ধ প্রেম-বিলাস অর্থাৎ অধিকরূপে উন্মীলিত মহামাধুরী-ধারাসার -বহন সমর্থ শ্রীকৃষ্ণে কেলিই যাঁহার একমাত্র বৈভব। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন সাক্ষাৎ মাধুর্যের মূর্ত্তি। আবার সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ব্রজদেবীগণের নিকট অধিকতর আস্বাদন বহনে সমর্থ হয়। গোপীগণের সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীর সর্ব্বাধিক বিকাশ। গোপীতমা শ্রীরাধারাণীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য বিকাশের পরাকাষ্ঠা। যে শৃঙ্গার রসকেলি নৈপূণ্যের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববাসনা পূরণ করেন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কোটী-কোটী ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও এই প্রকার কেলিবৈভব নাই, অন্যত্র যে ইহা একেবারেই নাই তাহা বলাবাহুল্য। তাই শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন- *"সা রাধিকা মে গতিঃ।"* সেই রাধাই আমার একমাত্র গতি হউন।

অন্যদিকে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয় অব্যভিচারী মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন হইয়া অনন্যভাবে রাধানিষ্ঠা প্রকাশে লিখিয়াছেন-

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবী ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্।।"

-শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-৯৬

"হে দেবি শ্রীরাধিকে! আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমা বিহনে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। -ইহা জানিয়া তুমি আমায় তোমার শ্রীচরণ প্রান্তে লইয়া যাও।"

তাইতো শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের বেদনা-

"হা রাধিকে প্রাণাধিকে মাধবজীবন।
তোমা বিনে তমোময় হেরি ত্রিভুবন।।
মরম জ্বালায় মরি, কেমনে ধৈরজ ধরি,
কোথা আজ প্রাণেশ্বরী সাধনের ধন।।
দেখা দাও প্রেমময়ি, দরশনে ধন্য হই,
নতুবা কেমনে সই, বিরহ বেদন।।" ১০৬

আবার প্রার্থনা দেখুন-

"কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে।
গোপীপদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে।।
(আমি) সখী সনে অভিসারে করিব গমন রে।
কবে আমি হেরিব সে যুগল মিলন রে।।
কবে দোঁহে কাঁচলিতে করিব ব্যাজন রে।
(আমি) কবে দোঁহে প্রদক্ষিয়ে জুড়াব জীবন রে।।
(কবে) দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম সংকীর্ত্তন রে।
(কবে) জগদ্বন্ধু শিরে রাই দিবেন শ্রীচরণ রে।।
(কবে) রাধাকৃষ্ণে সমর্পিব দেহমন প্রাণ রে।। ১৭৩"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু *"নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসার।"* সাধন নাম ও সাধ্য রাধাপ্রেম এই দুইকে এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখণ্ডরূপতা আধান করিয়াছেন শ্রীগৌরহরি আর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আস্বাদন করছেন-

(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
(জপ) রাধামাধব রাধিকা নাম।।

পূজ্যশ্রীশ্রী রমেশ বাবাজী মহারাজ

পূজ্যশ্রীশ্রী প্রেমানন্দ গোবিন্দশরণজী মহারাজ

জয় শ্রী রাধে

শ্রীশ্রীরাধা নামামৃত

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলছেন *"রাধিকা নাম।"* অতি অদভূত এই বর্ণদ্বয় *"রাধা"* নাম। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের নাম ও নামী ভিন্ন বা পৃথক বস্তু নহে বলিয়া অদভুত। *"অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ।" "রাধা"* এই বর্ণদ্বয় এবং স্বয়ং রাধারাণীতে কোন ভেদ নাই। অক্ষররূপে সেই মহাভাবময়ীরই কারুণ্যঘন অবতার। নাম ও নামীর অভিন্নত্বকে প্রতিপাদন করিতে গিয়া শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-

"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরেস্যৈব বর্ণরূপেনাবতারোঽয়মিতি।"

-ভগবৎসন্দর্ভঃ

শ্রীভগবান স্বয়ং বিশ্বজীবের হিতকল্পে প্রপঞ্চাতীত নিত্যধাম হইতে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া অনন্ত রসমাধুরী বিস্তার করতঃ ভক্তের চিত্তে ও জিহ্বায় নৃত্য করেন। শ্রীনামে নামীর অখণ্ড রসমাধুর্যের আস্বাদন নিহিত আছে বুঝিতে হইবে। বিশুদ্ধচেতা ঐকান্তিক নামাশ্রয়ী মহাত্মাগণই শ্রীনামের মাধুর্যাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সুতরাং অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার নামে মহাভাবরসের অখণ্ড আস্বাদন নিহিত রহিয়াছে- তাই রাধানাম অদভূত অর্থাৎ আশ্চর্যরূপ। মহৎগণই রাধানামের এই আশ্চর্যরূপতার অনুভব করেন। আশ্চর্য আনন্দকে বহন করিয়া আনে। আনন্দ অন্তরে প্রেমের পুলক জাগায়। তখন চিৎজগৎ মধুর, জড়জগৎ মধুর, মধুর রাধানাম মধুরাতিমধুর। প্রেমময়ীর অখিল আস্বাদন মাধুরী তাঁহার নামে অনুভূত হয়।

নামের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক আলোচনায় শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রী কৃষ্ণনামের অপার মহিমা গান করিয়াছেন। বিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য এক রামনাম এবং বিষ্ণুর তিন সহস্র নামের তুল্য এক কৃষ্ণনাম। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং অবতারী এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূলতত্ত্ব, তদ্রূপ

শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত নামের মূলতত্ত্ব।

"এত মহিমাসম্পন্ন যাঁহার নাম, সেই নামী স্বয়ং একবারমাত্র রাধানাম উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ নামোচ্চারণকারীর নিকট আকৃষ্ট হইয়া থাকেন কেহ "রা" শব্দ উচ্চারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গমনের জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং "ধা" শব্দোচ্চারণে তৎক্ষণাৎ পরম সম্ভ্রমের সহিত নামোচ্চারণকারীর পশ্চাদানুসরণ করেন।"

- শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

এইজন্যই শ্রীরাধানাম পরম অদভুত। শ্রীরাধানামের অপর একটি অদভুত গুণ এই যে- *"রাধা নামে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির সমস্ত পুরুষার্থ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।"* যাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, মহতের কৃপায় তাঁহারা যখন শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলারসের আস্বাদন লাভ করেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে স্বভাবতঃই বিতৃষ্ণা আসে।

"কৃষ্ণ পাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বস্তুতঃ ভক্তিশাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়, কপটতা বা কৈতব এবং ভক্তিসাধনার প্রবল অন্তরায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যবিহীন পদার্থের কামনাই জীব স্বরূপের কপটতা উহাই অজ্ঞানতম।

"ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি আপনি আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবৎ

ভগবন্নাম গ্রহণকারীর নিকটই যখন চতুর্বর্গ তুচ্ছ হয় তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক পরম সরস রাধানাম উচ্চারণ করিলে তাহা তুচ্ছ হইবে তাহা তো বলাই বাহুল্য। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পঞ্চম পুরুষার্থতা স্থাপন করা হইয়াছে।

"পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।।
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবাসুখ রস।।"

-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীরাধা নামোচ্চারণকারীর নিকট শ্রীরাধারাণী বিহনে কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রেমও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরাধানামের এতদ্ভুত বিশেষত্ব যে, শ্রীরাধানামরসের আস্বাদন, রাধাবিহীন একা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকেও আশ্রয়ীর নিকট তুচ্ছ রূপ হয়। রাধাপাদপদ্মনিষ্ঠ সাধকের প্রাণের সঙ্কল্প-

"হে বরোরু শ্রীরাধে। তুমি যদি কৃপা না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণে, ব্রজবাসে এমনকি শ্রীকৃষ্ণেই বা কি প্রয়োজন আছে?"

-শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি

সুতরাং শ্রীরাধা নামে প্রীতিনিষ্ঠ সাধকের নিকট পঞ্চম-পুরুষার্থ বা পুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এবং সেই প্রেমের প্রাপ্য অনন্ত সৌন্দর্যমাধুর্যময় একা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাধাবিহনে তুচ্ছ হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধানামের সর্ব্বোপরি অদ্ভুতত্ব এই যে স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন। অখণ্ড সৌন্দর্য মাধুর্যের পূর্ণতমনিলয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাধানামাঙ্কিত মন্ত্র নিত্যই

পরম প্রীতি ভরে জপ করেন।

শ্রীনাম স্বপ্রকাশতত্ত্ব, নাম গ্রহণেচ্ছু-সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ংই স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যেমনকি শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/২৩৪)এ উল্লেখ করছেন-

"নাম ও নামী অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া প্রাকৃত জিহ্বাদির দ্বারা গ্রাহ্য নহেন, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় নাম-সেবায় উন্মুখ হইলে শ্রীনাম স্বয়ং জিহ্বায়-স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণের নামের মহিমা-বর্ণনায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-

"একই সচ্চিদানন্দরসরূপ তত্ত্ববস্তু নাম ও নামীরূপে দুই প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছেন। তদ্রূপ একই অখণ্ড মহাভাবতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীরাধা ও "রা" "ধা" এই বর্ণদ্বয় রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ মাধুর্যমুরতি। নামীর সমস্ত গুণই নামে নিহিত আছে বলিয়া শ্রীরাধার নাম-মহিমাও মাধুর্যমণ্ডিত। সাক্ষাৎ মাধুর্যমুরতি শ্রী শ্যামসুন্দরও পরম প্রীতিভরে রাধানাম জপ করেন বা শ্রীরাধার উপাসনা করেন।

রাধাদাস্যই আমাদের পরমাভীষ্ট সম্পদ। পরাবিদ্যা-স্বরূপ *"রাধা"* এই দুইটী অক্ষর। যাহাতে সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম পরাবিদ্যা। শ্রীরাধা নামের অতি আশ্চর্য্যশক্তি। পরাবিদ্যা রাধানামেই আমাদের পরমাভীষ্ট রাধাদাস্যের সিদ্ধি হইবে।

শ্রীপাদ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন-

"রাধানাম সুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্তু মে বিহ্বলা।"

আমার জিহ্বা রাধা-নাম-সুধারস আস্বাদনে বিহ্বলা হউক।

অভীষ্টের নাম-সংকীর্ত্তন তদীয় প্রেমলাভের অব্যভিচারী সাধন এবং স্বয়ং সাধ্যও।

শ্রীবৃহদ ভাগবতামৃতে- শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিতেছেন-
"শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্পদ-সিদ্ধি নিমিত্ত তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন

পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় পরম বলিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ সাধন। এমনকি নাম-সংকীর্ত্তন-লম্পট মহানুভবগণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভক্তির ফল বলিয়াও মনে করেন। নাম-সংকীর্ত্তনে অবশ্যম্ভাবী প্রেম সঞ্জাত হয় বলিয়া তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তনকে ভক্তির ফল বলিয়াই উপচার করিয়া থাকে। প্রেমসম্পদ সিদ্ধির নিমিত্ত নামসংকীর্ত্তন সদা অব্যভিচারী উপায়। রসঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের রস-রূপতার অনন্ত আস্বাদন তাঁহার নামে নিহিত আছে বলিয়াও ইহা উপেয়।

গোপীভাবের উপাসকগণ শ্রীরাধারাণীর নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে রাধা সহচরীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য ভক্তগণও শ্রীরাধানামের মহিমায় অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

নাম-ভজনে নাম-রসের সঙ্গে নামীর রূপ, গুণ, লীলারও অফুরন্ত আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। *"প্রেমময়ী শ্রীরাধা।"* তাঁহার নামে প্রেমরসরূপতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তানন্ত নামী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যে রাধানামের মাধুরী আস্বাদনে বিভোর, সেই রাধানামের মহিমা যে অপরিসীম, ইহা সহজেই অনুভব হয়। সেই *"রাধানামামৃতই"* আমাদের জীবন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর তাহাই ঘোষণা করিতেছেন।

রাধানাম-বিহনে আমার ভজন-বিগ্রহ নিষ্প্রাণ। এই নামামৃত ব্যতীত আমার জগৎ শূন্য। তদীয় বিরহ কাতর আমি। বিরহের বিষম দিনে অভীষ্টের নাম, গুণ, লীলাই ভক্তের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়।

রাধানামের আস্বাদন মাধুর্যের তুলনা নাই। পরম নিগূঢ় ব্রজরসের মধুরভাবাশ্রয়ী ভক্তগণের ঐকান্তিক ভাবগ্রাহ্য শ্রীরাধানামামৃত দেবতা, এমনকি ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদি পরম অধিকারিক দেবগণেরও রাধানামামৃত পরম দুর্লভ।

আবার শ্রীরাধানাম *"প্রেমানন্দরসম্"* সাক্ষাৎ প্রেমানন্দস্বরূপ। যে সব সাধক সর্ব্বদিকে সাবধান হইয়া মহদপরাধাদি বর্জনপূর্বক শ্রীরাধার চরণে ঐকান্তিক ভাবে শরণাগত হইয়া শ্রীরাধানামের ভজন করেন,

রাধানাম তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় প্রেমানন্দরসরূপতার বিস্তার করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণি হইয়াও শ্রীরাধার পরমপ্রিয়, এই জন্যই আরাধনার এত চমৎকৃতি। প্রিয়তা ব্যতীত আরাধনার চমৎকারিত্ব নাই। তাঁহার আরাধনাটিই পরম রসময়, সিদ্ধির তো কথাই নাই। আমি রাধাদাসী, এই চিন্তা কতই মধুর, কতই আস্বাদ্য। সেই ভাবে অহর্নিশি বিভাবিত হইয়া যাঁহারা শ্রীমতীর সেবাচিন্তন রসে মগ্ন হইয়া আছেন, সেই অনুভবী ভক্তই জানেন, এই আরাধনা কত সরস, যাহার এক বিন্দুর আস্বাদনে রাধানিষ্ঠ ভক্ত রাধাবিরহিত শ্রীগোবিন্দের কৃপালাভের জন্যও ইচ্ছা করেন না।

জীবশক্তি সাধনরাজ্যে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম-সেবা লাভেই তাহার সর্ব্বোর্দ্ধ কক্ষা। সুতরাং *"এক"* শব্দে মুখ্য পরমপদের পরাসিদ্ধি, শ্রীরাধার রসবতী-আরাধনায় অর্থাৎ মঞ্জরীভাব সাধনাতেই লাভ করিয়া সাধক ধন্য বা কৃতার্থ হন। ইহাই সাধ্য-সাধনের চরম সীমা।

সাধককে প্রাকৃত সংস্কার ত্যাগ করিয়া চিত্তকে এই রসবতী আরাধনার যোগ্য করিতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ মায়ার দাস্য ত্যাগ করিয়া চিত্তে স্বরূপের পূর্ণতম অভিমান রাখিতে হইবে। সাধকের ধ্রুবতারার ন্যায় রাধাদাসীত্ব লাভে লক্ষ্যটী স্থির হওয়া চাই। রসিক ভক্তগণ সঙ্গে অভীষ্ট লীলাকথায় রত হইয়া স্বাভীষ্ট লাভের প্রবল উৎকণ্ঠায় ব্রজবাসই এই রসবতী আরাধনার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ।

"রসিকভকত সঙ্গে রহিব পীরিতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিয়া।"

-শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন-

"সাধক শ্রীশ্রীরাধামাধবের নাম, রূপ ও লীলার কীর্ত্তন ও স্মরণে যথাক্রমে রসনা ও মনকে নিয়োজিত করিয়া সুরসিক অনুরাগিভক্তের আনুগত্যে ব্রজবাস করতঃ ভজন-জীবন-যাপন করিবেন- নিখিল উপদেশাবলীর ইহাই সারমর্ম।"

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বলিতেছেন-

কি অমৃত রাধানাম, মধুর মধুর ধাম,
সর্ব্বানন্দ সুখের অবধি।
এই নাম চিন্তামণি, পরামৃত শিখরিণী,
দেবের দুর্ল্লভ রসনিধি ।।
ভুক্তি মুক্তি কর্ম্মী জ্ঞানী, যতেক সাধক শ্রেণী,
শান্ত চিত্ত-সদন্তঃ-করণ।
তা সবায় নামামৃত, বহুদূরে অবস্থিত,
নিকুঞ্জের নিগূঢ় রতন।।
সুমধুর রাধানাম, রসনায় অবিরাম,
প্রেমে যদি উচ্চারিত হয়।
মহাসুখ-কর প্রেম, লাখবাণ যেন হেম,
রসানন্দ হয়ত উদয়।।
নিজানন্দে নন্দসুত, এই রাধানামামৃত,
প্রেমনীরে করেন শ্রবণ।
গিরিধারী গোপীসনে, রাধানাম উচ্চারণে,
নৃত্য করে করিয়া কীর্ত্তন।।
বদনেতে "রাধে রাধে", বিনোদ নাগর জপে,
শ্যাম অঙ্গে প্রেমের বিকার।
প্রবোধানন্দেতে কয়, অনন্ত মহিমাময়,
রাধানাম জীবাতু আমার ।।

-শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি- শ্লোক সংখ্যা ৯৭ এর পদ্যানুবাদ

শ্রীরাধার ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের সাধনার পরাকাষ্ঠা। শ্রীপাদ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন-

"রাধানামৈব কার্য্যং হ্যনুদিনমিলিতং সাধনাধীশকোটিস্ত্যাজ্যা।"
-শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি।।৪৪।।

" যদি আমার প্রতিদিন শ্রীরাধানাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ হয়, তবে কোটি-কোটি শ্রেষ্ঠ সাধনও ত্যাজ্য হইয়া যাইবে।"

নাম-সংকীর্ত্তন সাধন-সম্রাট, নিরপেক্ষভাবে আশ্রয়ীকে প্রেমদান করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। রাগভজনের অপরিহার্য্য ভজনাঙ্গ স্মরণাত্মিকা প্রভৃতি ভক্তিঅঙ্গকেও শ্রীনাম আশ্রয়িভক্তে উদ্ভারিত করিয়া থাকেন।

"সংকীর্ত্তন হৈতে-পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম।।"

শ্রীনামকীর্ত্তন প্রভাবে অন্তরের মায়া-মলিনতা নাশ প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তি-সাধনায় যে-যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান আবশ্যক, শ্রীনাম সাধককে সেই সমস্ত ভজনাঙ্গ-যাজন প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মঞ্জরীভাবের উপাসনা অবলম্বন করিয়াছেন অথচ স্মরণাঙ্গ প্রভৃতি ভজন যাঁহাদের কষ্টকর বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ যদি রাধানাম-কীর্ত্তনে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরায় তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্মরণাঙ্গ প্রভৃতিতে আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং শ্রীরাধানামাশ্রয়ে তাহাদেরও কষ্টকর স্মরণাঙ্গ (সাধনাঙ্গ) প্রভৃতির প্রয়াস ত্যাজ্য হয় বুঝিতে হইবে।

"জয়তি জয়তি রাধানাম রসায়ন।
একমাত্র কার্য্য রাধানামের সাধন।।
অনন্ত সাধনাধীশ এই "রাধা" নাম।
নীরাজিত পদে কোটি পুরুষার্থ ধাম।।"

।। জয় শ্রীরাধে ।।
।। জয় গৌরহরি ।।
।। জয় জগদ্বন্ধু ।।

जय श्री राधे

साधन पथ साधकों का सहारा

(1) **श्रद्धा-** आदौ श्रद्धा-जिससे भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हों। अडिग, अचल और अटल विश्वास।

(2) **साधुसंग-** साधु, वैष्णव, महतों का संग- हरिकथा, श्रवण-कीर्तन, मानव जीवन के परम लक्ष्य का निर्धारण।

(3) **गुरुपादाश्रय-** अपनी स्वभाव व रुचि के अनुसार पहले मार्ग- ज्ञान, भक्ति या कर्म- को चुनकर फिर उस दिशा के- गुरुपादपद्मों का आश्रय।

● बिना गुरु या महतों के आश्रय के अहंता, ममता, अविद्या का नाश नहीं होता- यह अकाट्य है।

(4) **नामाश्रय-** श्रीगुरुदेव प्रदत्त नाम का एकमात्र आश्रय। भजनमय जीवन ही सफल जीवन है और नाम ही सर्वोपरि भजन है।

(5) **शरणागति-** श्रीगुरुदेव निर्दिष्ट इष्ट में सम्पूर्ण शरणागति। अनन्यभाव, अनन्य निष्ठा से सतत इष्ट का चिन्तन व सेवन।

(6) **आनुगत्य-** आगे युगल उपासना में आवश्यक है अनुगति। गोपी या सखी के आनुगत्य में हैं मंजरी, और उसी गुरुरुपा मंजरी की आनुगत्य में श्रीराधा दासी भाव से युगल की नित्य सेवा में उपस्थिति- यह साध्य शिरोमणि है।

(7) **नित्य ब्रजरज का सेवन करे-** श्री वृन्दावनधाम का आश्रय लेकर नामजप, नामकीर्तन, लीलाकथा-श्रवण-कीर्तन और फिर सिद्ध देह में स्थित होकर लीला स्मरण।

शुद्ध अन्तःकरण- आहार, विहार, चिन्तन एवं स्वभाव की शुद्धता से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि।

(8) सर्वत्र भगवद्दर्शन अथवा भगवान में अपनापन अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।

(9) **सर्वश्रेष्ठ साधन है-** श्रवण-कीर्तन अर्थात् नाम का आश्रय। साध्य-शिरोमणि है श्री राधाप्रेम अर्थात् मंजरी भाव उपासना।

(10) **सार-संक्षेप-** लक्ष्य स्थिर करके, श्रद्धापूर्वक गुरु पादाश्रय के साथ शरीर एवं संसार से ऊपर उठकर वैष्णवापराध वर्जित श्रीनाम एवं लीला का अविरल चिन्तन— परिणाम अपनी स्वरुप में स्थित होकर श्री युगल सरकार के नित्य सेवा की प्राप्ति।

पाइ रतन चीन्हों नहीं, दीनों कर ते डार। यह माया श्रीकृष्ण की, मोह्यो सब संसार।।

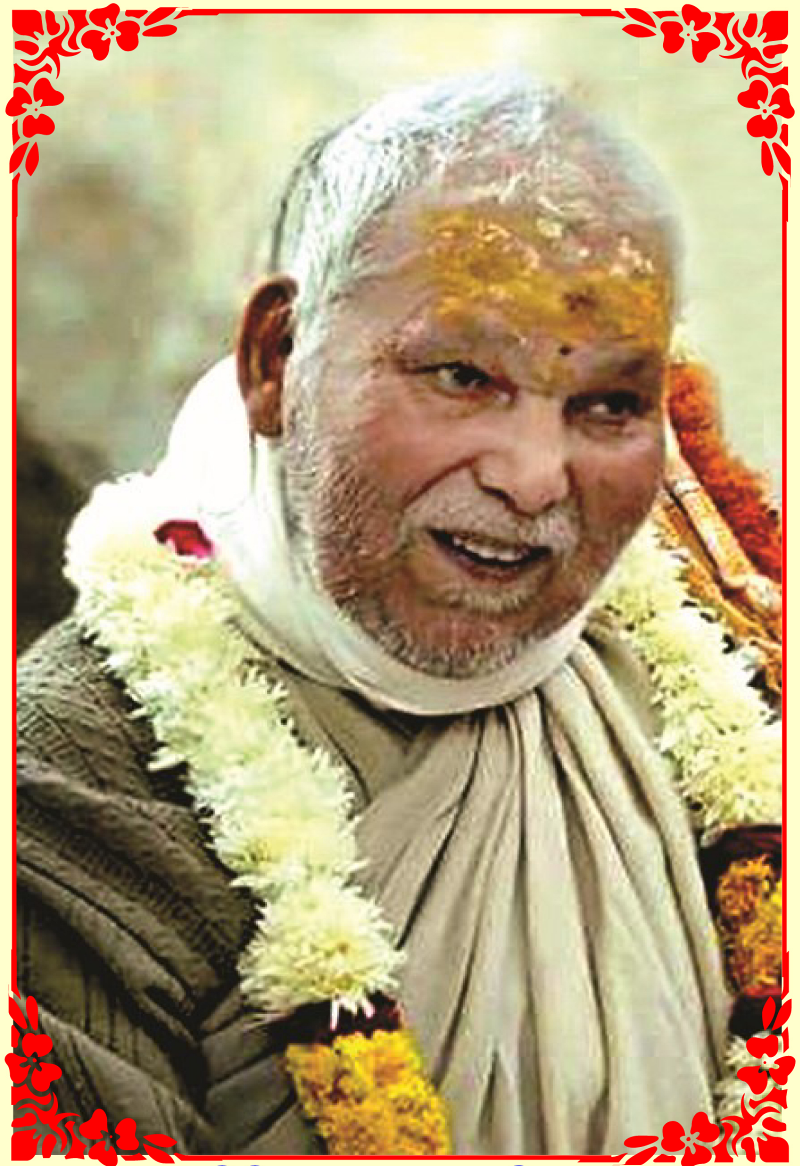

পূজ্যশ্রীশ্রী চন্দ্রশেখর বাবাজী মহারাজ

ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী